সপ্তদশ অশ্বারোহী

সূচীপত্র

ভূমিকা

কাব্যসংকলন সম্পাদনার ভার সাধারণতঃ লব্ধকীর্তি কবিদেরই বহন করা উচিত। কারণ একটু উঁচু জায়গায় না গেলে ভূমধ্যসংসারের পরিপ্রেক্ষিত সম্যক প্রতীয়মান হয়না। আমার মত একজন শিক্ষানবিশের পক্ষে, তরুণতম কবিদের কাব্যসংকলন সম্পাদনার ভার দুরূহ হতে বাধ্য। নিজেই শিক্ষানবিশ হওয়ার ফলে দুর্বলদের প্রতি আমার স্বভাবগত একটু দুর্বলতা থাকতেই পারে এবং এই সংকলনে সেই দুর্বলতার প্রতি শর সন্ধান করলে লক্ষ্যভেদ তেমন কঠিন নয় অবশ্য যারা সদ্য লিখতে আরম্ভ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদের ভয় অপ্রাসংগিক বলেই মনে করি। বর্তমান সংকলনের কবিরা প্রত্যেকেই ভবিষ্যতের কবি হতে পারবেন কিনা এই রকম কোনো অক্ষম পিঁচুটি অংক কষে এঁদের কাউকে নির্বাচিত করা হয়নি। এই সংকলন মাত্রই পরিচিতিমূলক। সত্তর দশকের কিছু কবিকে একই সংগে পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার একটা প্রয়োজন ছিল। পঞ্চাশ ষাটের পর সত্তরের কবিরা একটা স্পষ্ট অবয়ব পেতে চলল এরকম একটা সংকলন বাংলা কবিতার গতি নির্দেশে সাহায্য করতে পারে। এই বোধ থেকেই সপ্তদশ অশ্বারোহীর যাত্রা

তুমি ব্যারেলে হাত রাখলে
ক্ষিপ্র অশ্বারোহীর মতো আমি তাকে কাটিয়ে যাবো

(ভ্রমণ প্রস্তাব / দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

কিংবদন্তী ছিল বখতিয়ার খিলজীর সময়ে মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ বিজয় করেছিল। এই সংকলনের সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গবিজয় করতে পারবেন কিনা বলা শক্ত, কিন্তু এঁদের মধ্যে দু একজনও যদি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে পারেন এই সংকলনের সম্পাদক হিসেবে আমার পক্ষে গৌরবের কারণ ঘটবে।

কবি তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তাঁর নিজস্ব রুচির কবিতা ও কাল দ্বারা বিচলিত হন।

সত্তরের কবিতা অনুধাবন করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে

ষাটের কাব্য প্রচেষ্টা থেকে বিশেষ কতকগুলি কারণে সত্তর ভিন্ন পথবর্তী। এবং আশ্চর্য সত্তরের কবিতায় এতদিন যা তরুণতম কবিদের পক্ষে স্বাভাবিক বলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম—শিশুসুলভ চিৎকৃত অস্বীকার, যৌন-অভিচার ছদ্ম-নতুনত্বের মোড়কে পুরাতন অনুকরণপ্রিয়তা—সে সব কিছুই নেই। প্রিয় কবিকে প্রিয় রেখেও পরিত্যাগ করে তাঁরা বলতে পারেন,

আর 'তুই অবনী' যতই দেখিস না কেন কব্জি উল্টে ঘড়ি
বেজে আছে পাকা ন'টা, যতই ঘুরিস না কেন
কাঁধে ফেলে ভূতগ্রস্ত অবাস্তব অস্তিত্বখানা
আমার ওসবে কিছু যায় আসে না।

* * *

দুরন্ত চাবুক হাতে দাঁড়াচ্ছি উঠে পেছনেতে ঠেলে দিয়ে
নড়বড়ে ক' দশক আগেকার পুরোনো চেয়ার···

(এখনো আরো কিছুদিন / প্রসূনকুমাব মুখোপাধ্যায়)

জানিনা, স্বাধীনোত্তর এই সময়ের মধ্যেই দ্রুত পরিণতির কোনো বীজ নিহিত আছে কিনা। নাহলে কিভাবে এই মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই দ্রুততাল সময়কে সারা গায়ে মেখে নিয়ে ছুটে যায় তীব্র, অথচ নিরুদ্বেগ অশ্বারোহী।

সারা গায়ে মেখে নিয়ে সময়ের অমোঘ বারুদ
নিরুদ্বেগ ঘর ছাড়ে ৭০-এর প্রতিটি যুবা

(এখনো আরো কিছুদিন / প্রসূনকুমার মুখোপাধ্যায়)

এই 'নিরুদ্বেগ' শব্দটিই সত্তরের সংযোজন। পঞ্চাশের নির্ভেজাল পৌরুষের পাশাপাশি সত্তরের বীর্যবান উপস্থিতিকে এই ধরনের কয়েকটি শব্দ চিহ্নিত করে। এক ঘোষণাহীন, দখলীস্বত্বের জন্য ত্বরাহীন স্নিগ্ধবীর্য।

'কবিতা' এই মৌল শব্দটির প্রতিও সত্তরের দৃষ্টিভংগি অমনি নিরুদ্বেগ। আটপৌরে। এত সহজে 'কতিপয় কবির ভ্রমণ থেকে শব্দ ওঠে', (শ্যামলকান্তি দাশ), 'সে আমার ইচ্ছায় চালিত' (তুষার চৌধুরী), 'কপালের ঘাম মুছে কবিতার কথা ভাবে কেউ, কবিতাও বদলাবে এই সব দিবসের সাথে' (মৃদুল দাশগুপ্ত) ···'কবিতা কিংবা হাডুডু যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে।' (সুভাষ সরকার) এইভাবে প্রতিদিনের সংগে, ইচ্ছার সংগে, কবিতাকে একেবারে মানুষের প্রয়োজনে বেঁধে নেওয়া একান্তই এই দশকের ঘটনা বলে মনে হয়।

আমার অনবস্ত কবিতা, আমি লিখেছিলাম মানুষ-বিষয়ে। মানুষ
শিখেছে অনেক কিছু—হারমোনিয়াম বাজাতে জানে মানুষ, মাঝরাতে
মানুষ জেগে ওঠে হঠাৎ, মানুষকে ভালোবাসার জন্যে
মানুষ জানেনা শুধু, কিভাবে ঘুমোতে হয় লম্বা ঘুম। লম্বা ঘুমের
জন্যে, মানুষের টাইপ শেখা উচিত—প্রত্যেক বিকেলে
মানুষের উচিত ফুটবল খেলা।

(এপ্রিলের দুপুর, ১৯৭১ / অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়)

আমাদের লাজুক কবিতা, তুমি ফুটপাথে শুয়ে থাকো কিছুকাল

* * *

তুমি স্থির শুয়ে থাকো, কষ্ট সয়ে, মানুষের দীর্ঘতম ফুটপাথ জুড়ে
শুধু লক্ষ্য রেখো—অন্ধে না হোঁচট খায় কোনো ভিক্ষাপাত্র
ভুল করে তোমাব কাছে না চলে আসে,

(ফুটপাথে শুয়ে থাকো / রণজিৎ দাস)

এই 'ভিক্ষাপাত্রে' সত্তরের কবিদের কিছু ঘৃণা আছে। কবিতাকে মানুষের দীর্ঘতম ফুটপাথে শুইয়ে দিয়েও তাঁরা বায়বীয় অস্তিত্ব এবং সস্তা শ্লোগান থেকে কবিতাকে সমদূরবর্তী রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রধানত মফস্বল কিংবা শহরতলিতে যাদের জন্ম, স্বাধীনোত্তর বাংলা যাদের সমকালীন সময়, কাল, দেশ দুঃখী সমবয়সী তরুণ, সর্বহারা দরিদ্র মানুষ, নিজের সংসার, এই সবকিছুকে এঁরা কবিতায় অন্তর্গত করেছেন নিজেদের বয়স থেকে এবং নিজেদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বোধ থেকে। আমাদের কাল থেকে যে-সব অনুভূতি দুর্বোধ্য এবং অজানা, তা প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে এই সব চলতি চাল বহির্ভূত বিষয় নিয়ে লেখা কবিতামালায়। বাংলা কবিতায় এই মনোভংগিও সত্তরের একান্ত সংযোজন।

তুমি কি ভেবেছ নিজের কথা। ঘরেতে তোমার জন্য
উৎকণ্ঠায় বসে আছে একমাত্র রোজগেরে বাপ
তুমি কি ভেবেছো, তার বয়স,
ছোটো-ছোটো ভাইবোন দিয়ে ঘিরে রাখা মায়ের অসুস্থ শরীর
তোমার কি মনে পড়ে?

* * *

হঠাৎ

সেদিন দমকা হাওয়ার মত হেসে উঠেছিলো একদল মানুষ,
পাড়ার সেই দর্জির কাছেও তোমার শুনতে হয়েছিলো একদিন
'ওরকম পাৎলুনতো কবিরাই পরে'—
তুমি কবি নাকি ! কেন তুমি কবি হয়েছো ?

(কলকাতার একজন তরুণ কবির প্রতি / রানা দাস)

...বদলে যাচ্ছে কি প্রচণ্ড, ভিতব বাহির—

*   *   *

তাতো হবেই ! ডাইনে বাঁয়ে, ওপর নীচে হাওয়া আসছে বিষম জোরে

(রাতারাতি / সমরেন্দ্র দাস)

এই আতা সভ্যতা, ন্যাকা ও থুতুচাটা, নির্বীর্য এই সুধীসমাজ।

(মানুষের জিহ্বা থেকে / ধূর্জটি চন্দ)

একেক দিন এরকমটা হয়ে থাকে—নিস্তব্ধ অন্ধকারে
করুণ শিশিরের মতো ঝ'রে পড়ে আমার গরীব মা-র চোখের জল
নির্জন কারখানার পাশে হাঁটতে হাঁটতে খুব রাতে, বিশাল চিম্‌নি এক
আমার কানের পাশে নু'য়ে প'ড়ে লক্ষাধিক শ্রমিকের দুঃখ জানিয়ে গেল

(যে আছে তোমার স্বপ্নে / অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়)

ধ্রুবা : কোলকাতা, মিথ্যা উন্নয়ন, হাস্যকর শৃঙ্খলা নিয়ে মেতে থাকো তুমি
গম্ভীর, কালো লক্-আপে প্রতিবাদী যুবকের মৃতদেহ রক্ত ও মজ্জার
মধ্যে তার খেলা করে গ্রামীন বিপ্লব ও দখলী জমির ধান ওঠানোর আদিখ্যেতা!

(হায় কোলকাতা, তোমার অক্ষম গণতন্ত্র / অজয় সেন)

সব কিছু ধ্বংস হবে একদিন
নতুন পৃথিবীর সারল্যের কাছে
নতজানু হবে পুরোনো পৃথিবী, আমি জানি,

(চাকা / অরণি বসু)

পৌঁছতে পৌঁছতে বাজবে কমসে-কম এগারোটা
পথে জেগে উঠবে সন্ত্রাস, পুলিশের গাড়ি হেডলাইট ফেলে
বিচার ক'রে দেখবে তোমার মুখ—

(কলকাতার একজন তরুণ কবির প্রতি / রানা দাস)

কবে যেন চলে গেছে অহেতুক উদাসী হবার দিন
এখন পাওনা বোঝ নয়া পয়সার
কী রকম ভেঙে যায় সবকিছু

* * *

সময়ের রণ-পা সমস্ত মথিত করে কোনদিকে ফিরে যায় সবার অলক্ষ্যে
মুঠিবাঁধা হাত তোলো অথবা প্রতিবাদী স্বর
স্পষ্টতই ঘোষণা হোক
তুমি তো গ্রানাইট নও
তুমি শ্যেনচক্ষু শকুনের ক্ষুধাও নও
সরাসরি অস্বীকার করো তোমার চুক্তিপত্র ছিঁড়ে কুটি কুটি করো
চীৎকার করে বলো কোনো অশরীরিকে
এই জীবনের একটা মানে বই দরকার যার
কম্পোজিশন ও প্রুফ নিজের হাতে দেখে নেবে তুমি
আর কেউ নয়
তুমি তো বিচার প্রার্থী নও—স্বয়ং বিচারক...

(গতকাল / শান্তনু গুহ)

পূর্ব্ব পুরুষদের ফাঁকা এবং ফাঁপা অস্তিত্বের কবর খুঁড়তে গিয়ে যখন প্রতিবারই উঠে আসে 'কণিষ্কের আকারে ভয়াল জীবিত মানুষ' তুষার চৌধুরী——রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ভিন্ন চেতনা নিয়ে কবিতার সত্তর জাগ্রত হয়ে ওঠেন।

প্রকৃতি, কবিতার এক মৌল বিষয় এই প্রধানত মফস্বল ও শহরতলির পরিবেশে লালিত কবিদের কবিতায় শুশ্রূষার আকারে উপস্থিত নয়। এঁদের অন্তর-শায়ী নাগরিক উপলব্ধির সংগে প্রকৃতি এমনভাবে ওতঃপ্রোত যে প্রসংগত অমিয় চক্রবর্তীর একটি উক্তি আমার মনে আসে। তিনি বলেছিলেন এক দ্বীপের বন্য সৌন্দর্যের পাশে এক সর্বাধুনিক জাহাজ। অনেক উঁচু থেকে প্লেনের জানালায় বসে তিনি সেই সহাবস্থানের সৌন্দর্য দেখেছিলেন। কমল সাহার একটিমাত্র কবিতা ছাড়া (সুদাম সখা) এবং কিছু অন্য কারণে শুভ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ছাড়া বর্তমান সংকলনে এমন কোনো কবিতা নেই, যে কবিতায় সত্তরের নাগরিক মনন অনুপস্থিত।

প্রকৃতির দিকে শুশ্রূষার জন্য অভ্যস্ত হাত না বাড়িয়ে বরং

প্রকৃতি, আগে পাপমুক্ত করি সরল কুঠার দিয়ে

সরল কুঠারে পাত্রী বৃক্ষের হাত-পা ভাজি

তারপর তন্ময়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

(পরিবেশ যোগ্য হলে / সোমনাথ মুখোপাধ্যায়)

এবং দেশ, এই জন্মভূমি, এই জন্মভূমির মানুষ এক সদাজাগ্রত অন্তর্নিহিত সত্বার মত, এমন কি প্রেমের কবিতার মধ্যেও জানান দিয়ে যায়। এমন ভাবে শব্দের ভিতরে শব্দে, উপমায়—অন্য কথা প্রসংগেও সমকাল ও মানুষের কথা চলে আসায় তরুণতম কবিদের মমতাময় হৃদয়কেই উন্মোচিত দেখতে পাই।

আমি জানিনা শুভ মুখোপাধ্যায় কোন ভুবনেশ্বরী জননীকে নিয়ে এই মন্ত্র-মুগ্ধ কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা আমাকে যাঁর চিত্র দেখায় তিনি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মাতৃ বন্দনার এক আশ্চর্য জ্যোতির্ময় ঐতিহ্যের চালচিত্রে

সে বলেছিল,

মা, তোমার দুহাত ভরে আনন্দ নিকেতন—

*   *   *

…এবার ঋতু বদল করে দাও,

আবার এই আমার পথ

মুক্ত চলে যাওয়ার প্রান্তর

জন্মদাত্রী মায়ের দেওয়া

*   *   *

তার ভালোবাসায় ভোর হচ্ছে—

আগুনের জন্মদাত্রী মা

তাকে পথ দেখাচ্ছে

তার ভুবনেশ্বরী মা।

কবিতা সিংহ

মৃদুল দাশগুপ্ত

দুঃখ—১

বুঝি কি আছে বা কি নেই, এবকম মনে হয় সময়বিশেষে,
কতোদূরে দৃষ্টি যায়, কতোদূরে কতোদূরে কারা যেন হেসে খেলে ফেরে,
প্রিয় বন্ধুকে সাপ্তাহিক চিঠি দিতে ভুলে যাই, ক্রমশই ভয়ানক ঝুলে পড়ে
আমার শরীর, দুপুরবেলায় নিজের ছায়া দেখে এইসব মনে হয়,
বহুদিন ছাদে ওঠা হয়নি আমার, আমার আঙুল প্রায়ই যন্ত্রণায় টন্‌টন্‌ ক'রে,
দিন দিন বেড়ে বেড়ে বিশ্রী বড়ো হয়ে ওঠে নখ, আমার অগোচরে কেমন
স্বাভাবিক বৃষ্টি পড়ে, রক্ত ধুয়ে যায় দেহ থেকে,
আমাব অলক্ষ্যে আলপথে যেতে যেতে কপালের ঘাম মুছে
কবিতার কথা ভাবে কেউ, কবিতাও
বদ্‌লাবে এইসব দিবসেব সাথে,
কেউ কেউ হেসে ওঠে, হেসে ওঠে মেঘলা দুপুরে,
আজও সেই বোগামতো পোস্টম্যান আসে, মেয়েরাও
উঠে যায় মহিলা কামরায়.
কি হবে / হবে না কি এইসব নিয়ে তর্ক জমে ভীষণ জটিল

পানীয় দুধেব সাথে দেওয়া হয় আমাকে ওষুধ

প্রবাহ

যা কিছু দ্রুত কাছে চলে আসে, বলা যায় আকস্মিকভাবে এই শরীরের কাছে আসে।

ফিলিপসের বাতি, গভীর চক্রান্ত ও বিছানার লাস্য পরিহাস,

অমন সতেজ নাচ, শব্দমঞ্জির বাজে, বেজে বেজে যায়

—ফিরিয়ে দেবার দুঃখসবলতাপাপ আঠারো মাইলের দিকে

ছুটে চলে বেগবান ক্রমশ…ক্রমশ…

নখের ভেতরে লোভ, ঠোঁটে গাঢ় জ্বালা—এভাবে চারপাশে ঘটনাসকল

কি—কি আমাকে দেয় এবং দেখায়

—অভ্যাস থেকে উঠে আসে হাজার চিৎকার, পাপোষের ভেতরে কি

প্রকৃতি দাঁড়াবে

—উরুতেও চিড় ধরে, একান্ত গভীরে উড়ে আসে ভিনদেশি বিনিয়োগগুলি,

নীল আলো, নীল বিষ

কোথায় আগুন জ্বলে   দ্রিমিদ্রিমি ষড়যন্ত্র   বেতাল মানুষ ,

তাহলে কুঠার ভালো, অতৃপ্তির দিকে বাড়ানো ওই ওষুধের বড়ি

হা প্রবাহ

কি কি দেওয়া যেতে পারে, কি বা দিতে পারি বলো

এ জটিল ধরণধারণে,

প্রবাসে রয়েছি যেন স্ব-আবাসেই, অসুস্থ শব্দে খুলে যায়

দরোজা জানালা—হাওয়া আসে, এবং প্রকাশ্য হয়

ড্রয়ার সমেত কাঠের টেবিল, ধুলোজমা বই ও কাগজ,

কবেকার চিঠি পোষাকের ভাঁজেই হারায়, আর এই চামড়ার নীচে

ঝাঁকিয়ে ঝাঁঝিয়ে ওঠে চতুর হনন, প্রদাহ, হা প্রবাহ, নষ্ট ইতিহাস ;

খেলা জমে লুকোচুরি নিজের সাথেই, এভাবেই—

এভাবেই বেঁচে থাকা আঠালো জলের ভেতর,—জলের অপর নাম

কতো দ্রুত কাছে এসে ঘিরে ধরে চারপাশ থেকে,

সুলভ বাক্স হাতে চলে যায় ঘোলাটে মেয়েরা, শূন্যে হাসি বাজে,

কিছুই বিবেচনাযোগ্য হতে পারে না এই লোভী আকাট সময়ে,

অস্বাভাবিক জলছাপ নিয়ে ভ্রাম্যমান মানুষ সিগারেট খায়,

তামাশায় পথে ঘাটে জমে যায় ব্যবহৃত বেলুন, সাবানের ফ্যানা,

ঘাস ও কাদার মধ্য দিয়ে উড়ে যায় প্রাগৈতিহাসিক ট্রামবাসট্রেন,

অদ্ভুত জেল্লা মারে শরীরের ভেতরেই শকুনদল, কেরোসিন পেট্রল হাহুতাশ জলে,

ভালো ছিলো কতো কিছু, কতো কিছু ভালো ছিলো,—টিক্‌টাক্

বেজে যায় পরিহাস, খোঁচা লাগে সেকেণ্ডের সূক্ষ্ম বিষতীরে ;

কুকুর পোষার মতো নিজেকেই বেসামাল পুষে যাই নিজের ভেতর

রাস্তার সব আলো নিভে গেলে ট্রাফিকপুলিশ ছাখে একপাল ভেড়া
ক্রমশ এগিয়ে আসে, ক্রমশ তলিয়ে যায় তরল আঁধার—
রোমের ভেতরে জলে অলৌকিক শাদা বিদ্যুতের মতো গাঢ়তম চাঁদ
অবসাদ আরো দীর্ঘ মলিন কপোতছানার মতো ডেকে ওঠে, চতুর্দিক
থেকে উঠে আসে ভৌতিক ছায়ারা কেবল—ট্রাফিকপুলিশ ছাখে
স্থির বিন্দু থেকে সরে যায় প্রতিমার মুখ, ইতস্তত ভাসে তার স্থানে সভ্যতার
আলো, স্তন ; একপাল ভেড়া, স্বপ্নের ভিতব নাচে নিরিবিলি

বাতিস্তম্ভ থেকে ঝোলান পোস্টার ছিঁড়ে নিয়ে হেঁটে যায় ভিখিরী বালক
শিস দিতে দিতে, সমস্ত বাস, ট্রাম গরুবগাড়িব মতো দুলে দুলে
স্টপেজের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যায়, ফিকে হোয়ে আসে, অসহায়
নিজের গতির কাছে নিশ্চিত পবাজয় ভালো—থেকে থেকে শিখেছে পুলিশ
কোন কিছু মিথ্যে নয়, প্রতিদিন নিভে গেলে আলো নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বেড়ে যায়
ফুটপাতে বসে উপোসের গান গায় আব নিষ্পলক চোখে ছাখে কিছু লোক
আঁধারে মানুষ স্থির থাকে, সন্তর্পণে শুধু হেঁটে যায় ভিখিরী বালক।

[illegible] অশ্বারোহী

জেব্রা

বয়সের উষ্ণতা নিয়ে একপাল জেব্রা হঠাৎ বন থেকে ছুটে গেল আর এক বাদাড়ে।
সবুজ পতাকা ওড়াতে ওড়াতে ওরা ছুটে গেল হলুদের দিকে।
তুমুল আর্তনাদে সব সন্ত্রস্ত পাখি বন ছেড়ে চলে গেল সুরক্ষিত আঁধারে।
বয়সের সবুজ থেকে একপাল জেব্রা হঠাৎ ছুটে গেল হলুদ বাদাড়ে।
তারপর ক্রমশ শব্দ থেকে ছুটে যাবে নৈঃশব্দ্যের দিকে

তারপর আরো দূরে সুদূর প্রান্তরে দীর্ঘস্থায়ী প্রজনন ক্রিয়া এক অদ্ভুত নারীর সাথে।
নারীর সমস্ত দেহ বরফ মাখানো, যেন বরফ মাখানো এক বাক্‌রুদ্ধ নারী
নিপুণ দু'হাতে সাজায় কঠিন বিছানা, বিছানার চারপাশ জুড়ে হিম আস্তরণ।
অনুগত ভৃত্যের মত একপাল জেব্রা হঠাৎ বন থেকে ছুটে গেল অনন্ত প্রবাসে।

অনন্ত প্রবাসের পথে ওরা হলুদ থেকে ছুটে যাবে আরো যেন হলুদের দিকে ॥

রেসকোস

কমলাবণ্ডের পাখি কাকাতুয়া মাদী খরগোশ জামরুল গাছের পিছনে
একত্রিত কম্‌রেডস্‌ নোয়ানো সজ্‌নেপাতার চারুকলা
চার্বাক ফিবে এলে বলা হবে
বন্ধুবর্গ একা কলাকৌশল সিরিয়ালি ব্ল্যাক্‌মেল
পিছনে ফিবে যেতে চায় এই শস্তভূমি ছেড়ে
এমন বাখালের হাতে স্থলেখার দপ্তর
সে রাজদ্বাব থেকে বেশ্যাবাড়ি কোনখানে বাদ নেই সর্বত্রই
স্বতন্ত্র দ্বিপদ এক স্যুররিয়ালিস্ট

এই ঘোব মনসার দিনে সাপে ও নেউলে
একচোট ঝগড়া হয়ে যাক্‌ তারপব
কবিতা কিংবা হাতুড়ি যে কোন একটা

বেছে নিতে হবে চার্বাক তুমি ফিবে এলে
এই ত্যাজ্যপুত্রের মুখে আমাকেই ভাত দিতে হবে
নাহোলে বেজার রাস্তায় না-খাওযা লম্পট
কোন মহিলার মাংস ছিঁড়ে খাবে কমলাবণ্ডের পাখি কিংবা খরগোশ
কারো জানা নেই নাবিক-বিদ্যা এই নদীনালাসমুদ্রেব দেশে
হাঁসেরাই প্রজননস্মৃতি বেখে যায় জনন গহ্বরে
এবং অবশিষ্ট বেদব্যাস তুচ্ছত্র সংবিধান জুড়ে দেবে
কম্‌রেডস্‌
এভাবেই লড়তে হবে আমাদেবি ভিন্নতব
শত্রুব সাথে

প্রসূনকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষ মানুষীরা

ফুটপাথ ফেলে রেখে শস্য-ক্ষেতে চলে আসি ফিরে আসি মানুষের
বুকের নিচে ·· ······

মানুষেরা হাত রাখে কপালে আমার,
নিজেদেরই শরীরের প্রিয়তম রক্তে ধুয়ে দেয় কপালের
শুকিয়ে থাকা রক্তের পুরানো চিহ্নগুলো।

অবিশ্বাসী চোখে আমি চোখ রাখি মানুষীর সবুজাভ চোখে
চালধোয়া হাতে সে ছুঁয়ে দেয় চিবুক আমার।

আমাকে চিনিয়ে দেয়,—মানুষের চামড়া গায়
লোলজিহ্বা কুকুরগুলোর ঘরবাড়ি ··আস্তানা চিনিয়ে দেয়
ভয়ালদর্শন ওই কাগুজে বাঘের
মানুষেরা।

বিক্ষুব্ধ আঙুল তুলে দেখাই তাদের প্রতিদানে, শেকল কাটার যন্ত্র
কোনখানে পড়ে আছে, অনাদৃত সময়ের বারুদশালায় কোন ঘরে······

হৃদয়ের মশালেই তারা চিনে নেয় রক্তে-ভেজা পবিত্র সড়ক।

কি নিবি নে না কেড়ে

ঘেন্নায় আমার মাথা হেঁট হোয়ে আসে,—

মনে পড়ে যখনি, নগ্নতা ঢাকাব জন্য পোশাকের বিকল্পে আর
দিযেছিস কি আমাদের···মনে পড়ে যখনি, পুঁজিব জোয়াল কাঁধে
টিকিয়ে রাখছি তোর ভেঙ্গে পডা ইমাবত আব তাব ভিত········

(বুকের নিচে বারুদ কদ্দিন এই ভাবে একা একা বয়ে বেড়াব)

হারে সভ্যতা, এখনো ভাবিস নাকি চাবুক দুলিয়ে কেউ
শিস দিয়ে ডাকলেই ছুটে গিয়ে চেটে দেবো পাযেব পাতা
হরস্কোপ গুঁজে বেখে বালিশের খাঁজে
নিশ্চিন্তে এক ঘুমে বাত কাটাব···

বেয়নেট-বুলেট দেখে ঘাড হেঁট কোবে চোখ ঘুবিয়ে
রাখব নাকি ফ্যাশান প্যাবেড, পপ্‌ সংগীত আব নীবক্ত
প্যানপ্যানে শিল্প-চর্চায়·········

হাবে সভ্যতা, কি নিবি নে না কেড়ে—
পায়েব শেকল ছাড়া আর কিছু হাবাবাব
আছে না কি আজ আমাদের ?

এখনো আরো কিছুদিন

এখনো আরো কিছুদিন বিছানায় গুটিয়ে রাখব
চাদর বালিশ
কাঁধের ছেঁড়াটা শার্টে দিন দিন আরো বেড়ে যাবে
দবকারি কাঁটাটা লাগানো হবে না আবো ৩ বছর
আগে কেনা চটিটাব গায় কিছুদিন
গোড়ালির পাশে শক্ত হোয়ে থাকবে শুকনো কাদা
চন্দনের মত ঘাম শুকিয়ে থাকবে আবো কিছুদিন
উদ্ধত কপাল ছুঁয়ে।

আরো কিছুদিন আমি ধুযে মুছে তুলে রাখব
কলমেব নিব
কিলোদরে বেচে দিয়ে পদ্যেব বইখাতা সযত্নে টুকে বাখা
ক্লাশনোটগুলো
শস্তায় চাবুক কিনব ১ খানা।

এখনো আরো কিছুদিন সারারাত স্বপ্নহীন অস্থিব ঘুমের পর
বেরিয়ে পডব বাসিমুখে
ভয়ংকর চিৎকারে হাতে নিয়ে ক্রুদ্ধ চাবুক।
বেপরোয়া ঢুঁডে যাব এধর সেধর
চৌমাথার মোড থেকে প্রতিটি লেন / বাইলেন
নির্মম চাবকে যাব প্রতিটি ধূর্ত-কূট জালিয়াত
সুদখোর আর আমার জীবন যৌবন নিয়ে জুয়ারত আমলা
নিরপেক্ষ পত্রিকার যুধিষ্ঠির সম্পাদক
আর তার সাংবাদিক ভাঁড়গুলোকে।

আর তুই 'অবনী' যতই দেখিস না কেন কবজি উল্টে ঘড়ি
বেজে আছে পাক্কা ন'টা যতই ঘুরিস না কেন
কাঁধে কেলে ভূতগ্রস্থ অবাস্তব অস্তিত্বখানা
আমার ওসবে কিছু যায় আসে না।

*

ওসব কেবলই ভাই কাগজে ছাপার প্রয়োজনে।
মাইরি আমার আর এইসব ভালো লাগে না।
এইসব শব্দ নিয়ে নিয়েট ন্যাকামি আর কাল্পনিক দুঃখবোধে
বিষাদ-বিলাস বা নিরাপদ দূরত্ব থেকে শুয়োরের
মত আর্তনাদ মাইরি আমার আর ভালো লাগে না।
এইসব চিত্রকল্প আঙ্গিক গবেষণা হিজড়ের নাচের মত
অসম্ভব বিরক্ত করে আমায়।

টের পাচ্ছি প্রতিরাত্রে ঘুমজোড়া চোখে
আঙুল চালাতে গিয়ে কড়কড়ে ভাতে
বেঁকে যাচ্ছে শিরদাঁড়া ফুলে উঠছে দু'পাশের রগ···
আব প্রতিদিনই একটু করে ঝুলে যাচ্ছে ফ্যাকাশে চোয়াল।

এরকমই স্ববিরোধী বেঁচে বর্তে থাকা
হালার পুত মাইনষেরা এভারেই বাইচ্যা থ্যাকা কয়
৫ জন মানুষেরই সম্ভ্রান্ত সুখের নিচে অবিরাম
ডানা ঝাড়ে ১০০ জন মানুষের নির্মম অসুখ···
আর মল-মূত্র-কফের স্রোতে ব্রেষ্টস্ট্রোক কেটে কেটে
ডাঙ্গাছোঁয়া রোগাক্রান্ত কতিপয় মানুষ।
একে বল উত্তরণ?
একে বল বেঁচে থাকা?
হারামির বাচ্চাদেরও আভূমি সেলাম দিয়ে
মানুষের চামড়া গায়ে শুয়ে থেকে
মানুষেরই হাতে বোনা চাদর পেতে···

অথচ দূরে কাছে শেকল ছেঁড়ার গানে
হাঁসুয়া ঝলসে উঠে রোদে।
সারা গায়ে মেখে নিয়ে সময়ের অমোঘ বারুদ
নিরুদ্দেশ ঘর ছাড়ে ৭০ 'এর প্রতিটি যুবা
আর তখুনি নির্বোধ কেউ কলকাতার দুঃখে

চায় ট্যাচু বনে যেতে।
আমি দুঃখে হেসে ফেলি ফিরে আসি লাইব্রেরী / সিনেমার
কাউন্টার ছুঁয়ে
আচম্বিতে বিকর্ষনে ঠেলে দেয় পার্কস্ট্রীটের
লুঙ্গী পরা যুবতীর প্রোফাইল আমায়
ময়দানের গাঢ় অন্ধকারে।
ভয়ানক রাগে চুল ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে
পটাপট ছিঁড়ে ফেলি কচি কচি ঘাস
আমি দুঃখে ফের হেসে ফেলি।

এবার আর নয় আমার সমস্ত দুঃখ
দানা বাঁধছে সুকঠিন শ্রেণী-ঘৃণাতে
বাঁকা চোখে চিনে রাখছি কে আমার শত্রু
আর মায়ের পেটের ভাই কারা।

দুরন্ত চাবুক হাতে দাঁড়াচ্ছি উঠে পেছনেতে ঠেলে দিয়ে
নড়বড়ে ক'দশক আগেকার পুরোনো চেয়ার...
ভাবতে পারিস 'অবনী'
মিছিলে আমার গলা কি দারুণ শোনাচ্ছে বলতো...
রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে মহড়া নিচ্ছি আমি প্রতিটা শত্রুর...
রাত কাটাই নিরুদ্বেগ মজুরের স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের মেঝেয়...

তাই আরো কিছুদিন
বিছানায় গোটানো থাকবে চাদর বালিশ
কাঁধের ছেঁড়াটা শার্টে দিন দিন আরো বেড়ে যাবে
দরকারি কাঁটাটা লাগানো হবে না আরো ৩ বছর
আগে কেনা চটিটার গায় কিছুদিন
গোড়ালির পাশে শক্ত হোয়ে থাকবে শুকনো কাদা
চন্দনের মত ঘাম শুকিয়ে থাকবে আরো কিছুদিন
উদ্ধত কপাল ছুঁয়ে।

ঝর্ণা দাস

আক্রমণ

রকেটের মতো হু-হুশ করে অন্যাকাশে উড়ে যায় ইদানীং
ঘর থেকে ঘর
উড়ে যায় বিছানায় সংরক্ষিত সুখ, টেবিলের সাজানো-গোছানো পরিচ্ছন্নতা;
এখন খোলা দরজা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে
ফুটপাত ঝুলনে৷ বড় বাস্তা, ও তাব
আর্তনাদ ছড়ানোব মতো অলি-গলি।

ঢুকে পড়ে,
ছেঁড়া কাগজেব নীচে লুকানো মানুষের বাতিল ভালোবাসা
জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাওয়া সিগারেটের চিন্তাহীন মুণ্ডু
স্থানান্তরের ধূসর টিকিট, পাতার ইচ্ছাহীন হলুদ শব
পাষাণের মতো চকচকে চোখ ঢুকে পড়ে বিজ্ঞাপিত যুবতীর
বাঁকানো ঠোঁটের অনেক নীচেরকার শরীরের ইয়ার্কি
ঢুকে পড়ে, দীর্ঘ হাই-তোলা নাগরিকের মুখ থেকে গড়িয়ে পড়া তরল শব্দ
এবং
ধৈর্যচ্যুত হর্ণ বেজে যায় আমার মনের ভেতর
সারি সারি শব্দের ট্রাফিক জ্যাম
কবিতা লিখতে বসে…
আমার আর অন্য কোনোখানে যাওয়া হয় না—দীর্ঘদিন
যতদূর হেঁটে যাই—ছুটে যায়
এই বিধ্বস্ত ঘর, সাহিত্য-চর্চার অপরিচ্ছন্ন টেবিল,
যতদূর ফিরে আসি
-ফুটপাথ ঝুলনো বড় রাস্তা, ও তার আর্তনাদ ছড়ানোর মতো অলিগলি

নিহত্ত চোখ তোমার

নিহত্ত চোখ তোমার ভালোবাসার ঠোঁট জুড়ে চূড়ান্ত বিভীষিকা
বড় যন্ত্রণা এখন যন্ত্রণায় জ্বলে যায় অল্পবয়স্ক এই কবির বুক
রক্তের ভেতব ছড়ানো ছিটানো তোমার উপহারেব বইপত্তর
গোছানো হয় না
একটিও সফল রমন হয় না

সাম্প্রতিক শব্দের শয্যায়

সাম্প্রতিক শব্দেব শয্যায় শুধু অশ্লীল ভাবে শুয়ে থাকা
বাদুড়ের পালকের মত দীর্ঘনিঃশ্বাসে শুধু এপাশ ওপাশ

শুধু চেয়ে চেয়ে ভাখা তোমাব কাব্যগ্রন্থেব উলঙ্গ শরীর

কলকাতার একজন তরুণ কবির প্রতি

হাজার বছরের পর, আরো কত হাজার বছর পার হয়ে গেলো
পাখীর নীড়ের মতো চোখ ভেসে উঠলো না আর
এই দেশে

তোমাকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আজ
আজ মানে, সমস্ত জীবন
এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সকলবাত
অজগরের মতো দীর্ঘ প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে
শুষে নিতে হবে রাজ্যের সমস্ত অন্ধকার
কিংবা
জ্বলে পুড়ে বাঁচতে হবে শ্মশানের মতো কেবলই আর্তনাদ ছড়াতে হবে বাতাসে
ভেবে ছাখো
আজ বিশ বছর ধরে তুমি দাঁড়িয়ে আছো এইভাবে—যেন বিশ হাজার বছর
তুমি তোমার কাঁধের ঝুলি নেড়ে-চেড়ে ছাখো
এ পর্যন্ত সময় মতো পাওনি কিছুই—একমাত্র সহানুভূতিহীন শব্দ আর ঘৃণা ছাড়া

যেমন এখন
এই শীতের রাতে তোমাকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে—কোনোখানে
একরাশ মজা লুটছে তোমার অদৃশ্য যান।
এখন কি ভাবছো তুমি ?
উদোম ভিখিরির দিকে তাকিয়ে থেকে
কোটের বোতাম খুটছে কেন ঐ সুন্দর মানুষটা,
রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে বলতে
কেন ঐ চশমাধারী মহিলাটার চোখা হয়ে আসছে মুখ,
পান-চিবনো ঐ মেদবহুল মোটা লোকটার
বাস্তবিক কোনো সুখ আছে কি না পৃথিবীতে ?
জানি না, আরো কত কিছু ভাবনা আছে যে তোমার,
কত কিছু ভাবতে পারো যে !

তুমি কি ভেবেছো নিজের কথা !　　　　ঘরেতে তোমার জন্য
উৎকণ্ঠায় বসে আছে যে একমাত্র রোজগেরে বাপ
　　　　　　　　　　তুমি কি ভেবেছো তার বয়স,
ছোটো-ছোটো ভাইবোন দিয়ে ঘিরে রাখা মায়ের অসুস্থ শরীর
　　　　　　　　　　তোমার কি মনে পড়ে ?

এখন রাত ন'টা বেজে পাঁচ, আস্তানার কাছাকাছি
　　　　　　পৌঁছতে-পৌঁছতে বাজবে কমসে-কম এগারোটা
পথে জেগে উঠবে সন্ত্রাস, পুলিশের গাড়ি হেড লাইট ফেলে
　　　　　　　　　　বিচার ক'রে দেখবে তোমার মুখ—
সে মুখে, তোমার কপাল ঢেকে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর দুঃখের মতো জট-ধরা চুলে
তোমার গালের বিশৃঙ্খল দাড়ি দেখতে দেখতে
　　　　　　　　　　হঠাৎ
　　　　সেদিন দমকা হাওয়ার মতো হেসে উঠেছিলো একদল মানুষ,
　　পাড়ার সেই দর্জির কাছেও তোমাকে শুনতে হয়েছিলো একদিন
　　'ও-রকম প্যান্টলুনতো কবিরাই পড়ে'
তুমি কবি নাকি !　কেন তুমি কবি হয়েছো ?

শ্যামলকান্তি দাশ

সব্জি ভোলে সচ্ছলতা যার

শেকড়ে মাটিতে যে সব্জিকে পরোয়া করে না
সব্জি ভোলে সচ্ছলতা যার
কুক্কুটের শেষডাকে তাকেই আহ্বান করি ভোরে
নতুন কাপড়ে সেই একতাল শুচিগন্ধ—
দৃষ্টিগ্রাহ্য ভিত তার—নিভুর্ল ললাট
প্রতিষ্ঠায় ডাকি তাকে সনির্বন্ধ
ন্যায্যত মানুষ সে, বিপরীতে ফেরাতে পারি না।।

তাকে আমি তপস্যায় রাজা করি, আর তার মননধর্মিতা
মাখি গায়ে, কষ্ট হয়, ত্বক পাংশু
চোখের বাস্তব কাঁপে রক্তের ভাষায়
তাকেই প্রত্যক্ষে ডাকি······জ্ঞানবান গৃহস্থের মত !

সে আসে, নবান্নের ভাতগুলি শক্ত হয়······গমনের রাস্তাঘাট
বড়ো হয় প্লেটোনিক প্রেম আর ইয়ুক্যালিপটাশ !

শব্দের মৃত্যু, হাতে

হাতে তার শব্দের মৃত্যু লেগেছিল—ভয়ে ভয়ে
এইমাত্র দেখা—হঠাৎ ছলনাভরে খুলে যায়
জটিল বিমূর্ত মুঠি, রিপু ও ইন্দ্রিয়,
এবং বিছুটি লেগে
　　　কখন যে লম্বা কালি ছায়া হয়,
রহস্যকুহক বাজে টিং টং, বৃষ্টির ভাবনা আসে,
ঐটুকু দৃষ্টিসত্য বহির্ভূত—
এবং খেলার মাঠে কতবারে ক্ষেমঙ্কর ফল ভাঙে,
উড়ে পুড়ে কাকবক ভস্ম হয়, ভবিষ্যৎ পথভ্রষ্ট ছোকরার বক্রপাত
সাইকেল চালায়, ঘাসে ব্র্যাণ্ডির গন্ধ লেগে
প্রত্যেক কবির জন্য গান হয়—
ভয়ে দেখা নয় ঐটুকু
হাতে ভাতে শব্দের মোহমান মৃত্যু লেগে থাকে।

স্নায়ুশস্ত্রে চেয়েছিলো তাকে

পূজার মণ্ডপে দু'টি নোথ ভেঙে কষ্ট হলো
কষ্টকে চেয়েছিলো খাজুরাহো, সাবাবেলা হিক্রু সন্ন্যাসী
স্টিমারের আলো থেকে বিপক্ষে দ্বিতীয় কথা······
অইতো ভোবেব নাভি, কাট্‌কুট্‌ ছড়াছন্দ
প্রতিমার পড বিন্দু রঙের মুকুল
মাছির শরীর ভ্রাণ নিতে চেয়েছিলো দৃষ্যত পাগল
কতিপয় কবির ভ্রমণ থেকে শব্দ ওঠে······
শ্বেতবর্ণ শব্দকোষে নিয়ে যেতে চায
ভুলেব ভেতরে সেই পতনের নেবুপাতা ভক্তি ভয়
হিঁদুর দেবতা তাকে স্নায়ুশস্ত্রে চেয়েছিলো
অভিকর্ষে, সংস্কৃতে
ধাতুব শেকড়ে তাকে, নিটুট পাখির মত বলা হোল তাকে

নোথ ভেঙে কষ্ট হোল—কষ্টের ভেতবে ওড়ে ভ্রাণ ?

সমরেন্দ্র দাস

ঘাই

সংগীত অভিমুখে তোমাদের শব্দ সমারোহ ঘাই দিয়ে ওঠে
উঁচু নীচু তট ভেঙে জলের নিখুঁত ভাজ
আহারে তর্ক, শব্দের মোহ, কি—বিস্তার
কেন তবে অলঙ্কার, দেহ ঘিরে ভাঙে ঝড়
বেষ্টন, বেষ্টন, তোমাদের পার নেই।
সন্তর্পণে জলের নৈকট্য আমি তুলে নিতে পারি অসঙ্কোচে
মায়াবী সুতোর রেখা ধরে রাখে কে।
তার কাছে সব শব্দ ভেঙে ভেঙে প্রতিমার গড়ন—
সেই দিকে তাকাতে চাই, তোমাদের তাতেও বিস্ময়।

রাতারাতি

হাওয়া খেলছে, বাইরে ঘরে, বুঝতে পারি একটা কিছু আসছে কাছে
ঘরের কোনে ঝুলঝাড়ুটা যখন তখন উঠছে নড়ে
দম খেয়ে আজ থমকে আছে, থাকবে জানি কাছের মানুষ
বদলে যাচ্ছে কি প্রচণ্ড, ভিতর বাহির কিসের ভয়ে—
সামনে পেছন ঝুঁকছে দেয়াল রাতারাতি
ভয় তাতে কি ?
মানুষজনের মুখের আদল বদলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি ?
তাতো হবেই । ডাইনে বাঁয়ে, ওপর নীচে হাওয়া আসছে বিষম জোরে
ঝুলঝাড়ুটার সঙ্গে সঙ্গে নাচছে তোমার সাদা দাড়ি।

আমাদের জীবনে সূর্য-সমুদ্র

আমাদের জীবনে সমুদ্র নিয়ে আসে কী অদ্ভুত শঙ্কাহীন গতি
সহস্র ঢেউ আসে শত্রুর মতো, ভাঙে প্রতিচ্ছায়া
দুরন্ত জয়ের নেশা কে না ভালোবাসি।
বিপুল আনন্দে দেখি শৈশবের গন্ধ নামে চোখে মুখে
সব লুপ্ত আত্মীয়তা লেগে থাকে নোনা জলের রেখায়
বালিমাটি সরে গেলে চমকে উঠি, চোখ কাড়ে সূর্যের আলো—
সে তো বড় সন্নিকটে থেকেছে চিরদিন
করেছে বীর্যবান লক্ষ পল, অনুপল ধরে অপরূপ কৌশল ক্রিয়ায়
রজত ফেনার অবিরাম ডানাগুলি শঠতাগুলি কেড়ে নেয়,
করে নিক্ষেপ, দূরে—বহুদূরে সেই সূর্য-মন্দিরে
আর আমরা পুনর্বার ফিরে আসি আপন প্রকোষ্ঠে নিষ্কলুষ মনে।

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়

এপ্রিলেব দুপুর, ১৯৭১

তাপ্সিমাবা এক কোটেব নিচে ঝবে পডলো বুডোর চুরুট, ঘুমিয়ে পডলো
বুডো। ঘুমেব ভেতব, যেকোনো বই খুললে সমস্ত অক্ষব ইদানীং
ঝুবঝুব ঝ'বে পডে যায—জানো নাকি, ঘেয়ো কুকুবেব লোম
ঝ'রে যায় কোন্ দুঃখে? অভিমানবশে?
এই এপ্রিলের ঘুমন্ত দুপুবে, নিজেব ছায়াব দিকে ফিবে যেতে যেতে হঠাৎ
থমকে দাঁডায় একটা গাছ।
যেকোনো গাছই আজ আমাদেব বন্ধু হতে পাবে। যেকোনো গাছেব
পাশে, তুমি, লিখে ফেলতে পাবো তোমাব সুন্দবতম কবিতা
আমাব অনবদ্য কবিতা আমি লিখেছিলাম মানুষ-বিষয়ে। মানুষ
শিখেছে অনেককিছু—হাবমোনিয়ম বাজাতে জানে মানুষ, মাঝবাতে
মানুষ জেগে ওঠে হঠাৎ, মানুষকে ভালোবাসাব জন্যে
মানুষ জানেনা শুধু, কিভাবে ঘুমোতে হয় লম্বা ঘুম। লম্বা ঘুমেব
জন্যে মানুষেব টাইপ শেখা উচিত—প্রত্যেক বিকেলে
মানুষেব উচিত ফুটবল খেলা।
একদিন আমাব মা, ঝুডিব ভেতব থেকে আমাকে উপহাব দিয়েছিলেন
আমাব নির্ভুল মাথা—আমাব চোখে,
সাবাটাবছব আমাবই আঙ্গুলেব ফাঁকে ফাঁকে বাববাব ঘুবে বেডিয়েছে
লম্বা চুল, আবো লম্বা হয়ে ঝুলে পডেছে কাঁধেব ওপব।
ববফেব ঘবেব মধ্যে এসকিমোবা কিভাবে ঘুমোয়—এইসব
ভাবতে ভাবতে, ভাবতে ভাবতে পেবিয়ে গ্যাছে আমাদেব গবম দিনগুলো
উজ্জ্বল দোকানেব ভেতব সাবি সাবি বিস্কুটেব টিন, আব মিষ্টি গন্ধ
আব ঐ যে দেখছো কাঁচেব শো কেসে, সাবিসাবি মাটিব
পুতুল—ওবা-ও একদিন
ধবে ফেলবে মানুষেব চালাকি। একদিন লাফিয়ে লাফিয়ে, ঠিক
নেমে পডবে ওরা দোকানেব বাইবে। দোকানেব ভেতর,
পডে থাকবে শুধু ওদের মাটির পোশাক আর জুতো, শুধু
মাটিব দস্তানা আর টুপি।

যে আছে তোমার স্বপ্নে

বইয়ের দোকান থেকে কখন বেরিয়ে আসি আমি সদররাস্তায়
একেকদিন, এরকমটা হয়ে থাকে—ময়লা হাত
গ্রীষ্মের দুপুর থেকে খুঁটে তোলে সরল দুঃখ, আর আজকাল
সমস্ত কিছুই আমি ছেড়ে দিয়েছি প্রায়—ওষুধ খাওয়াও
ছেড়ে দিয়েছি আমি গত বছরের শেষাশেষি, আর আজকাল
মাঝে-মধ্যে বিশ্রাম চায় এমনকি আমার ফুটো ছাতাটাও—বড়ো হাস্যকর!

যে-কোনো রাস্তার মোড়ে, মনে হয়, কোনো এক পুলিশবাহিনীর সাথে
দেখা হয়ে যাবে আমার হঠাৎ
যে-কোনো রাস্তার মাঝখানে, মনে হয়, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়বে আমার
চোখ, আর হেসে উঠবে সেই পুলিশ বাহিনী—মাঝে-মধ্যে
শুয়োরেও হেসে ফেলে নাকি

প্যারিসের কোন চৌরাস্তায়, বুড়ো প্রেভেয়ার খুলে ফেলেছিল তার কোটের
বোতাম আর টুপিভর্তি মজার কাহিনী
সমস্ত পৃথিবীময় বাদামখোসার মতো ছড়িয়ে পড়েছে

হাতের আঙুলগুলো ক্রমশ আরো লম্বা হয়ে যাচ্ছে সরু পেন্সিলের মতো
একেকদিন, এরকমটা হয়ে থাকে—নিস্তব্ধ অন্ধকারে
করুণ শিশিরের মতো ঝ'রে পড়ে আমার গরিব মা-র চোখের জল
নির্জন কারখানার পাশে হাঁটতে হাঁটতে, খুব রাতে, বিশাল চিমনি এক
আমার কানের পাশে নুয়ে প'ড়ে লক্ষাধিক শ্রমিকের দুঃখ জানিয়ে গেল
কখন মানুষ, সশব্দ রেলগাড়ি চেপে চলে যায় মৃত্যুর গভীরে
অনেক মৃত্যুর কাছে হেরে গিয়ে তবুও আবার মানুষ মৃত্যুর কাছে হারে,
হেরে যায়—

আমি চাই, প্রতিটি দোকান, দোকানের বাইরে এসে খুলে দিক অন্ধকার পেট
প্রতিটি বইয়ের থেকে প্রতিটি বইয়ের আত্মা উড়ুক আকাশে, আমি চাই

যে আছে তোমার স্বপ্নে, ঐ দেখো, উঠে আসছে সে
রান্নাঘরের কোণ থেকে

ফুটো আলোয়ান

পৃথিবীর সমস্ত ফুটো আলোয়ান আজ উড়ছে আকাশে—
এইসব ওড়াউড়ি
খুবই ভালো—দেখা ভালো কার থুতু কতো সাদা,
কতোটা নিখুঁত
মানুষের দু' চোখের সামনেই খেলা করে সভ্যতার ভূত

তুমিই শেখালে শিল্প একদিন ক্লাউনের টুপির আড়ালে ঠিক
আঙুরের মতো বেদনার সবুজ মসৃণ
খবরকাগজ পড়া শেষ হলে মনে পড়ে সাবানের গন্ধমাখা
দিন—এইভাবে
কতো কতো দিন আসে চলে যায় দুবরাজপুরের পথ ধ'রে
কতো কতো জামা ওড়ে—পুরনো হয়নি আজো কিছু—
রাত্তিরের ট্রেন
গম্ভীর আওয়াজ তুলে পিছলে যায় বারোটার কাঁটা—
পৃথিবীর সমস্ত আঁধার
তোমার শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে, লক্ষ্যগোচর চোখ বুজে থাকে—
আপাদমস্তক ঢেকে
পাশের বাড়ির পঙ্গু বুড়ো এক প্রতিদিন তিনতলার ছাদে
স্মৃতিচারণের সাথে খোঁটে মরামাস—ঘন ঘন কাশে
কে ঠেলবে বলো আজ সভ্যতার ক্রিপ্‌ল্‌-চেয়ার, কে ঠেলবে বলো

অরণি বসু

স্থানিক

এইখানে, এইখানেই অবিশ্রাম একশো দু'ঘণ্টার সাইকেল-ভ্রমণ হ'য়ে গ্যাছে
এইখানে, এইখানেই নিয়মিত লালশালু, বিস্তীর্ণ সশব্দ চীৎকার,
হিংসা ও অহিংসার সমান শোষণ,
হয়ত বা প্রেম নয়, যৌগিক প্রেমের ক্রীড়া,
নিত্য ব্যবহারে মলিন, তবুও কোথায় যেন বিমর্ষ উত্তেজনা।
এই সবই ঘুরে ফিরে আসে বারবার, বসন্ত থেকে আরেক দীণ বসন্তে
মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমে জ'মে ওঠে হাততালি, নক্ আউটে কিংবা শুভ্র ক্রিকেটে।

এটা ঠিক শহর নয়, অথচ শহরতলীও বলা যাবে কিনা সঠিক জানি না
এই দু'টি ভৌম শব্দের অর্থ শেখা হয় নি আমার, ঠিক জানি, উচিত ছিল।
এরই বুকে, স্তনবৃন্তে আঠার মত জড়িয়ে আছে আমার লুপ্ত কৈশোর,
উদার অসহায়তায় শঙ্কিত ক্রন্দসী অদৃশ্য এরই গহনতম প্রান্তে
অসহায় উদারতায় তাকে লজ্জিত করিনি কোনদিন—
এইখানে, এইখানেই কূট কার্যকারণে জড়িত আমার ভবিষ্যৎ আশ্বাস,
যদিও আজো এর সঠিক সম্বোধন শেখা হ'ল না।
জানি, ইচ্ছাকৃত মূর্খতার কোন ক্ষমা নেই—
ক্ষমা, তাই-চুং ধান নয়,
উপাংশু হত্যার মত অনায়াস সংঘটনযোগ্য নয়—
এইখানে, এইখানেই একদিন মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, সেজন্যে ভয় পাই না,
ভয় হয়, আরো কত শব্দের অর্থ আজো আমার অজানা?
আরো কত আগ্নেয় পাপে হাত সেঁকে নিতে হবে?

চাকা

জলের ভিতর উল্টোভাবে শরীর কেঁপে ওঠে,
জলের কিনারে আমি,
সমস্ত পৃথিবী এখন গ্রামীন সঞ্চয়ের মত অন্ধকার,
শুধু জলের ভিতরে উল্টো শহরে সভ্যতা
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় হল্‌দেটে আলো—,
এই সময় আমি ও আমার ভিতরে মরচে পড়া স্বপ্ন
আমি ও আমার ভিতরে কূট হতাশা ও হিংসা
সবাই এক সঙ্গে তাকায় অবিনশ্বর জীবনের দিকে।
এ সবই অমোঘ,
দৈববানীর মত কেউ যেন উচ্চারণ করে ঈষৎ উঁচু থেকে,
সব কিছু ধ্বংস হবে একদিন
নতুন পৃথিবীর সারল্যের কাছে
নতজানু হবে পুরনো পৃথিবী, আমি জানি,
কাঁচের গ্লাসের মত সব বিশ্বাস ধীরে ভেঙ্গে যাবে সেই একদিন,
মন্দির ও মসজিদ একসঙ্গে ডুব দেবে বিক্রান্ত সমুদ্রে,
সম্ভাব্য সব গতি অতিক্রম করবে মানুষ সেই একদিন
যেরকম শেষবার স্নান সেরে উঠে আসে বলির নিরীহ উপচার।

তার পরেও জলের কিনারে এসে দাঁড়াবে অন্য একজন,
অন্য এক আমি,
তারও শরীর উল্টে যাবে নিষ্পাপ জলের ভিতরে
জলের কাছে, একমাত্র জলের কাছেই কোন শ্রেণীবৈষম্য নেই।

প্রতীক্ষা নয়, প্রতিশোধ

এই প্রবীণ অন্ধকারে কারা! কে কে এখনো বসে আছেন ?
বারান্দার বাঁ পাশে আজ চাঁদ ওঠে নি
তাই অন্ধকার হাওয়ায় খুলে যাচ্ছে এলোচুলের মত,
হাওয়ায় শব্দ নেই, পুষ্পে গন্ধ নেই, হাসি নেই,
যেন পারিপার্শ্বিক ঘিরে রেখেছে অস্বাভাবিক শীতলতা
সভ্যতা ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ নিবিড় অন্ধকার অরণ্যে,
শুধু আপনারা বসে আছেন কান খোলা রেখে—
কার জন্যে আপনাদের এই ক্লেশ স্বীকার ?

নিমন্ত্রণ কর্তারা কেউ নেই আজ এখানে, অন্যমনস্কে অনুপস্থিত,
সুস্থ জীবনযাপন খুব অপরিচিত অতীত শব্দ ব'লে মনে হয় ;
আমিও বিকেল থেকে বসে আছি চুপচাপ, আর নয়,
এই গুমোট অন্ধকারে মানুষের পাশে বসে মানুষের হিম নিঃসঙ্গতা
আমার অসহ্য বোধ হ'লে মনস্থির ক'রে উঠে পড়ি,
হেঁটে পেরিয়ে যাই লম্বা বারান্দা, নেমে আসি ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে
দেউড়ির দরজা খুলে ফেলে একবার পেছন ফিরি, ফিরতেই হয়,
পরস্পর পরস্পরের বিপরীতে চোখ রেখে বড় ক্লান্ত আপনাদের বসে থাকা
অবিকল পুতুলের মত,
মানুষের ব্যর্থ বেঁচে থাকা দেখে ভয় করে, ভীষণ ভয় করে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের সমুদ্র ওদের দর্পিত জাহাজ ডুবে গ্যাছে ওরা জানে না,
কৃত্রিম আলোর নীচে ওদের অট্টহাসি চাপা কান্না ব'লে ভুল হয়,
কোন রকমে বেঁচে আছে যারা তারা ব'লে দেবে
সুস্থ জীবনযাপনের সঠিক ঠিকানা ?

হাসি পায়, উঠে আসুন, বন্ধুগণ, আপনারা তো জানেনই
অভিধানে প্রতীক্ষা শব্দেরই কাছাকাছি কোথাও
প্রতিশোধ শব্দেরও মানে লেখা আছে।

কমল সাহা

অরণ্যে আমি একা

আশ্চর্য ছবির দেশে একদিন শীতের সন্ধ্যায়
কাদামাখা ঝোপঝাড়ে বাঁশের আড়ালে
ডোরাকাটা নীলশাড়ি ছায়ার ভিতরে
কাচবালা শঙ্খবালা বালিকারা খেলে
অচেনা গাছের মালা—ঝোপঝাড় ফুলফল
অচেনা জগৎ

কাছাকাছি কেউ নেই
রুগ্নপ্রাণ নগ্নদেহ কালো এক বালকের ডাকে
স্বপ্নভঙ্গ হল যেই
চেয়ে দেখি : অচেনা অরণ্যে আমি একা।

খুব নিকটের তিনি যখন

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সমস্ত শরীরটা
ঢেকে নিয়ে উদাসীন গৈরিক বসনে
শুয়েছিলেন।
আমি তাঁকে রক্তের যৌবনদৃপ্ত
কয়েকটা সদ্য-লেখা কবিতা শোনাই।
নিবিড় উত্তাপে শুনতে-শুনতে
এক সময় তিনি চোখ বোজেন।

মুহূর্তের মধ্যে আমি মনে মনে
আরেকটা কবিতা সাজাই :
টেলিফোন / ট্যাক্সি / হাসপাতাল
টেলিফোন / ট্যাক্সি / স্তব্ধতা
ফুল / মালা / শ্মশান
আগুন / আগুন / এবং যবনিকা।

তিনি চোখ মেলতেই
অপরাধীর মতো বলি . যাই।
আশ্চর্য যাদুকর হয়ে
হাত ধরে তিনি বলেন : আরেকটু বোসো,
সন্ধ্যে হ'তে অনেক দেরি আছে।

কমল সাহা

সুদাম সখা

সুদাম সখা

মনে পড়ে না সেই যে নিবিড় অন্ধকারে

হাতের মুঠোয় ঝিঁ ঝিঁ পোকা বন্দী করে

পৌষালিগীত গেয়েছিলাম ?

মনে পড়ে না

শিবঠাকুরের ছদ্মবেশে ভাঙ্ ধুতুরায় মত্ত হয়ে

আমরা দুজন ঘোষপাড়াতে উধাও হতাম ?

আবার যখন বাগানবাড়ির গাছের থামে

তারার ধুলো ছড়িয়ে যেতো

আমরা তখন ঠান্‌দিদিদের পরণকথায়

হারিয়ে যেতাম।

এই অরণ্যে আজকে আমি

ছড়াই শুধু বুনোঘাসের শুকনো পাতা

সুদাম সখা

নেই কি মনে ছেলেবেলার

গাঙের ধারের সেই কথাটা ?

বলেছিলি

সারাটাদিন সারাজীবন আমরা দুজন

ভাসবো হয়ে শোলার ভেলা—

ঘর পালানো সেই যে নেশা

এমন করে কোথায় এনে

সাজালো এক শূন্য ভেলা।

সুদাম সখা

সেদিনগুলোর সরলকথা মনে পড়ে না

একটুও কি মনে পড়ে না ?

রণজিৎ দাস

সম্বোধন

আষাঢ়ে মেঘের দিকে ঘনঘোর ছুটে যায় আমাদের সম্বোধন :

'নীলাঞ্জন, প্রিয় নীলাঞ্জন !'

মেঘ, সে তো সংস্কৃত জানে না, জানে যতীনের বড়বোন

তাঁর রসগ্রাহী কণ্ঠ আমাদের প্রতি আসে—

'আহা, ওই সম্বোধনে কি নিপুণ ফুটে ওঠে মেঘের নিহিত শস্যছবি'

শুনে আমাদের কিছু গর্ব হয়, কিছু যৌন-উত্তেজনা হয়

যতীনের বড়বোন ছাদের আলিসা থেকে সরে যায় বোবা পৃথিবীতে

ফলে যে শূন্যতা নামে ছাদের আলিসা ঘিরে, মেঘ তাকে স্পর্শ করে

মেঘ আরো স্পর্শ করে গ্রাম-গঞ্জ-শহরের গুপ্ত ক্ষতছাপ

আমরা মেঘের দিকে, মেঘ আমাদের দিকে, মধ্যে বুকফাটা ক্ষেত

নদীনালা, যুবতীবিধবা আর আমাদের তুচ্ছ কবিতা, তাই

আষাঢ়ে মেঘের দিকে আর্ত চোখে ছুটে যায় আমাদের বাবু সম্বোধন—

'নীলাঞ্জন, প্রিয় নীলাঞ্জন !'

মানুষীর মধ্যভাগ

তোমাব একান্ত আমি ধবে থাকি, অন্যপ্রান্ত নিয়ে খুব
খেলা কবে গন্ধমুষিকেরা
মধ্যভাগে তুমি স্বয়ং, বিশ্বানুবাগিনী, বসে থাকো তানপুরা হাতে

প্রেম, ঘ্রাণ, সুব মিশে এইভাবে জন্ম নেয় তোমাব বাগানবাড়ি
বাগানবাড়িব নামে গূঢ় এক বৃক্ষবীজ, ছায়া
তোমাব পূর্ণতা তবে মুখাপেক্ষী, ঔপনিবেশিক, দুঃখী পৃথিবীব মতো
তাই বুঝি ট্রেন থেকে নেমে তুমি সহসা নিভিয়ে দাও
প্লাটফর্মজোড়া এক প্রতীক্ষাব সম্মিলিত আলো
ক্ষীণ গলিপথ ধবে ছুটে যেতে চাও নীল বিবাহের দিকে
সবলবেখাব মধ্যে নীববে বিধৃত থাকে তোমাব ঔদাস্য, পলায়ন
তোমাব একান্ত আমি টেনে বাখি, অন্যপ্রান্ত দাঁতে কবে ছুটে যায়
গন্ধমুষিকেবা
স্থিতিস্থাপকতা নেই তোমাব চবিত্রে, গানে, তাই
দুই বিপবীত টানে বেড়ে যায় মধ্যভাগ, উদাসিনী তোমাব শূন্যতা।

ফুটপাতে শুয়ে থাকো

আমাদের লাজুক কবিতা, তুমি ফুটপাতে শুয়ে থাকো কিছুকাল
তোমার লাজুক পেটে লাথি মেরে হেঁটে যাক বাজারের থলে-হাতে
বিষণ্ণ মানুষ
শুদ্ধ প্রণয়ভুক তোমার শরীরে কেউ ছ্যাকা দিক বিড়ি জ্বেলে—
নিতান্ত ঠাট্টায়
তুমি স্থির শুয়ে থাকো, কষ্ট সয়ে, মানুষের দীর্ঘতম ফুটপাত জুড়ে
শুধু লক্ষ্য রেখো—অন্ধে না হোঁচট খায়, কোনো ভিক্ষাপাত্র
ভুল করে তোমার কাছে না চলে আসে,
ধীরে ধীরে রোদ-ঝড়-শীতের কামড়ে তোমার সোনার অঙ্গ কালি হবে
ওই পোড়ামুখে তবে ফুটবে তামাটে আভা পৃথিবীর, তাই দেখে
ফুটপাতশিশুরা ভারি ঝলমলে হাততালি দেবে
তাদেরকে দিও তুমি ছন্দজ্ঞান, লজেন্স দিও না।

শান্তনু গুহ

রোদ

এই রোদ।

লেগে আছে হরপ্পার শরীরে।

তেমন কোন উৎস নেই সুখ্যাত—স্নানাগারে,

ভুল ভেঙে যায়, আজ আর—আনাগোনা নেই,

সেদিনের নারী কঙ্কাল থেকে সিলিকেট হয়ে গেছে কখন

আমার বুকের কাছে সুতীক্ষ্ণ আঘাতের মতো

যে ছিলো একদিন কঠিন ও পেলব,

বিষক্রিয়া কবে শেষ হয়ে গেছে তার।

কারা যেন অশ্বমেধের উপচার নিয়ে চলে গেছে

খাইবার গিরিপথে,

যাগযজ্ঞ শেষ হলে তারাও ফিরে গেল প্রান্তসীমায়.

এখন প্রতীক্ষায় রাত দিন সপ্তাহ ফুরিয়ে যায়

নারকীয় আক্রোশে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে

সমস্ত সৈন্যের দল।

দুর্দান্ত বর্ষা নামলে মেঘস্তরের একটু ওপরে

কারফিউ জারি হলেও এই রোদ

এই রোদ লেগে থাকে শরীরে আমার

টিকটিকির লেজ

টিকটিকির লেজ নড়ে দেয়ালে
লক্ষ্য এক রাত্রির মথ
আদিম সরীসৃপের এই নবতম প্রতিনিধি স্থির
শুধু তার লেজ নড়ে ধ্যানে অথবা আক্রোশে
ওর চোখ নিষ্পাপ বলয়
পা দুটি খড়কে কাঠির মতো অসহায়
এবং বেচারী মথ
সে এসবের কিছু জানে না
বিছানায় শুয়ে ছাদের কাছাকাছি
আমি এই খেলা দেখি
টিকটিকি ডেকে ওঠে তিনবার
টিক্‌টিক্‌টিক্‌
লাফ দেবার আগে সে লেজটিকে শূন্যে ঘোরায়
সমস্ত ঘর মথটির মৃত্যু দেখবার জন্য রুদ্ধশ্বাস
আমার স্নায়ুতন্ত্র কাঁপছে
ঠিক এসময়
খ'সে পড়ে বিশ্বাসহন্তারক লেজ
কবে কোন বিস্মৃত বনভূমিতে
এভাবেই মানুষের লেজ পড়েছিলো খসে
যাবতীয় সুখ ঐ রেশমের মথের মতো
ফিরেছিলো রাত্রির অন্ধকারে

এখন কার জন্য দুঃখ ক'রবো আমি
ঐ লেজ—ব্যর্থ টিকটিকি—সোনালী মথ
না বিছানায় এই প্রতীকি আমির জন্য

শান্তনু গুহ

গতকাল

অনেকদিন পর ঘুমে থাকা ফসলের মাঠে খেলা করছিলো চাঁদ
তার অভ্রথালা নিয়ে
আমাদের ঠোঁট তখন লোভার্ত আতুর
এই পৃথিবীর বাইরে কোনো দ্বিতীয় পৃথিবী থেকে
আমরা পেয়ে গেছি শূয়োরের মাংস ও ধাউনি মদ
এখন উত্তপ্ত নারী পেলে ফিরিয়ে দিতে পারি অনায়াসে তাকে
বলে দেবো
তুমি তো পাথর নও
গ্রানাইট ফাটিয়ে আমি নামাতে চাই জল
বহুদূর থেকে কে ডাকে আমায় ফিরে আয় ফিরে
এই স্তনে ওষ্ঠে ঊরুতে জঙ্ঘায় রূপোলি পায়ের পাতায়
নাভির অতলান্ত গভীরতায়
মধ্যযুগের হিম শীতের রাত্রে তোমার বিছানায়
জ্বালানী কাঠের মতো সাতটি শরীর রেখেছি
ভেবে দ্যাখো তোমার জন্যে শুধু ওলিম্পিক মশালের মতো তুমি
আগুন হাতে একবার ঘুরে যাবে এই পথে তারপরে
নিজেই জানো না কোথায়
কখন যেতে হবে
কেন যেতে হয়
তোমাকে
প্রত্যাখ্যান তোমার নয় তুমি তো শেখোনি সেসব
তাছাড়া পোষাকের প্রয়োজন আছে নিশ্চিত
এইবেলা সাড়া দাও
কবে যেন চলে গেছে অহেতুক উদাসী হবার দিন
এখন পাওনা বোঝ নয়া পয়সায়
ধারাপাত নিয়ে এস ছোটোবেলাকার

আবৃত্তি করো পুরোনো সুরে
গড়ে ত্যাখো বালির পাহাড় ঘরবাড়ি সারি সারি দোকানপাট
কী-রকম ভেঙে যায় সবকিছু
সময়ের রণ-পা সমস্ত মথিত করে কোনদিকে ফিরে যায় সবার অলক্ষ্যে
মুঠি বাঁধা হাত তোলো অথবা প্রতিবাদী স্বর
স্পষ্টতই ঘোষণা হোক
তুমি তো গ্রানাইট নও
তুমি শ্যেনচক্ষু শকুনের ক্ষুধাও নও
সরাসরি অস্বীকার করো তোমার চুক্তিপত্র ছিঁড়ে কুটি কুটি করে
চীৎকার করে বলো কোন অশরীরিকে
এই জীবনের একটা মানে বই দরকার যার
কম্পোজিশন ও প্রুফ নিজের হাতে দেখে নেবে তুমি
আর কেউ নয়
তুমি তো বিচারপ্রার্থী নও—স্বয়ং বিচারক
অনেক ছোটোবেলায় ভাবতুম সময় পেরিয়ে যাবে
তারপরে বন্ধুর হাত এভাবেই
সবকিছু ভেঙ্গে গেলে এক দারুণ মাজাকি হবে
চারজনের কাঁধে চেপে বেশ দূরে চলে যাবো
বাইরে ধরাছোঁয়ার
দিবাস্বপ্নের মতো এইসব হারিয়ে কতোকাল আগে
২.
এইভাবে হারাতে হারাতে বৃত্ত থেকে উপবৃত্তে
অসংখ্য বিন্দুর ভিড়ে হারিয়ে
এখন ঠিকানা নেই
আমি গতকাল ফেলে এসেছি কোনো দেবতার পায়ের কাছে
কোনো জীবনবীমা নেই আমার
স্মৃতির ছায়া কেবল প্রত্যেকটি হাটে ভিখিরীর মতো
ঘোরাফেরা করে

শব্দের জন্য শাদা পাতার জন্য লোভী এখন
একটি নিষ্পত্র বৃক্ষ পেলেও তাকে আমি য়্যালবামে রেখে দেবো
অপরাহ্ন আসছে দ্যাখো অগোচরে
রৌদ্রে মোমের শরীর গ'লে যাওয়ার মতো নিঃশব্দে
এখানকার কেউ নই আমি-অতিথিও নই
ভিখারী মানুষের মতো অক্ষম
নির্বাচিত নারীর শরীর তন্তুজ শাড়ি ও যাবতীয় শিক্ষিত বোধ
ততটাই আমার ঠিক যতোটা আমার নয়—

৩.

শাদা পথ সামনে এসে দাঁড়ালো আবার
দর্পণের মতো এক্ষণ ভাবনার দরোজায় দাঁড়িয়ে বল্লো
আমি প্রপিতামহ তোমার   দ্যাখো তো চেনো নাকি

'আমরা' তখন দূরে তাকিয়ে আছি হলুদ আলোর দিকে

তুষার চৌধুরী

ঈশ্বরী কবিতা

এই যে ভরণ করি ভগকে পধাকে

এই আমি

আমিই যাজক যুবা লম্পটের সংগে হেঁটে যাই

পুংশাবকের সংগে দুবে

রৌদ্র অথবা বৃষ্টির পরিপোষণ আমাকে

আমি তোমাদের সম্মিলিত করি

তোমাদের ঠোঁটে

মদ্য ও মিথুন সপ পেলব লেহন রাখি

যখন যা খুশি

তোমাদের মজ্জা খাই নাড়ী ও নরম তন্তু শিরা

তোমাদের ক্রুদ্ধ করি তোমাদের পুরোহিত করি

এই যাকে প্রসাধিত হতে দিচ্ছি আমার রক্তাক্ত আবেগে

এই যাকে ছুঁড়ে দিচ্ছি বাতাসের মধ্যে ভিন্ বাতাস

সে আমার ইচ্ছায় চালিত

আমার পিতাকে আমি প্রসব করেছি

যদিও আমার জন্ম হ'য়েছিল সমুদ্রগুল্মের গর্ভফুলে

ইস্কাবনের কবিতা

কার কাছ থেকে আমার ফুসফুসের সোঁদা গন্ধ লুকোতে চাই ?
কে আমার সেগুন কাঠের চিতা আর ঈশ্বরকে জ্বালিয়েছ ?
কোন নারী আমার ফুসফুসের ছবি জমা করেছ
আমার শৈশবের ইস্কাবন ও চকমকি পাথর ?
ইস্কাবনের যোনিতে দু'টি বিপরীতমুখী তীর, আমিও আমার সন্ধিবয়স
সন্ধিবয়সের প্রতীক এই ফার্ণপাতা
সবুজপাতা সূচিত করে বঙন ফুলের কবর, আমার মায়ের মৃত্যু
মা, তোমার বিবাহদিনের ফুল বাবাকে আচ্ছন্ন করেছিল ? অথচ আজ
রজনীগন্ধা ঘুমিয়ে পড়েছে সেই মেয়েটির জঙ্ঘায়
যে আমাকে দারুণ অভিমানী করেছিল
এখন এক ছিমছাম সুখী পরিব্রাজকের চোখে দেখি
একজন মানুষ তার চেয়েও বিশাল চাকা টেনে নেয়
দেখি এক স্বজন রাতে আমাব প্রিয় বাগানে ফেলে যাচ্ছে এ কার অবৈধ ভ্রূণ
আমি ভয় পেয়ে তাকে ডাকি সে ফিরে তাকায় না চলে যায়
আমি ঘুরে মৃত ভ্রূণটির দিকে পা বাড়াতেই দেখি, একি !
এক ফাটলের ভেতরে সেটি ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে কেন
পূর্বপুরুষের কবর খুঁড়তে গিয়ে প্রতিবার আমি দেখি
আমার পিতামহ প্রপিতামহ কেউ না
উঠে আসেন কণিষ্কের আকারে এক এক ভয়াল জীবিত মানুষ
এ কোন শিঙাবাদকের জুতো প'রে হেঁটে ফিরছি আমি
সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাব এমন কোনো কোঠাবাড়ি নেই
রক্তের ভেতরে তুমি ক'টি জীবিত সূর্য্যমুখী পুষেছিলে
আত্মায় বিঁধছে যে পেরেক তাকে উপড়ে ফেলতে পারেনি কোনো নারী
ফলত খুলি থেকে গোড়ালি পর্যন্ত এই যা কিছু
সব একদিন এক বিপুল ইস্পাতের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে, আর তখন
আপাতভাবে যা কিছু নশ্বর তাই অবিনশ্বর নয়—এই হিসেবে
তোমার অস্ত্রের চেয়েও তোমার মুখগহ্বর স্বতন্ত্র ও আদরনীয় হবে

ধাতু সড়ক

মা্তুস্ত্রীর জন্য কিছু ফসফবাস আমি চাই
শরীবেব জন্য যেমন নুন গন্ধক ও আয়োডিন
তোমাব শাদা দাঁতের ফাটলে একটা ধাতুর শেকল চাই
হাড়েব ফুটোয় এক একদিন স্বপ্নেব প্রবাহ টের পেয়ে গেলে
নিজেব শরীবকে ভুলে যেতে ইচ্ছে করে
স্মৃতিব ভেতব এক বিদূষকের টুপি হলুদ পাতার মত ওড়ে
এক মস্ত ছাইদানের চুল্লীতে চামড়ার চিতা জ্বলে—এইসমস্ত এইসমস্ত আর
বেগনী দোয়াতেব ভেতব স্বতন্ত্র বেগনী চোখে পড়ে

একটা বিপন্ন রাতেও আমার পারংগম পশ্বাচার
ব্যবহৃত রক্তেব মত সময়ের গ্রন্থিচ্যুত আমি
আলজিভেব সবুজ শাসন পেরিয়ে এই নষ্ট ঋতুতে
যুবতীর রোমরহস্যে আমার লোলুপ স্বপ্ন ও ঘুম
ঘুমের মধ্যেও কেউ ঘুমিয়ে যায়
নির্ভুল ফুটোয় মশারি অনর্গল বায়ু ত্যাগ করে

মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ আমার রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধকেও গুঁড়িয়ে দ্যায়
প্রতিরোধ আমার বৈরাগ্যের মৌল উপাদান ছিল
এখন আমার ইচ্ছে আসবাবের নৈঃশব্দে ফিরে যাব
বিকল বিদ্যুৎপাখার কাছে ও ঘুমন্ত মেয়েমানুষের ঘরে
মৃত ডালিমের গর্ভে আমি ফিরে যাব, পরম্পরছেদী হাওয়ায়
নির্বিবাদ নির্বংশ এই কালাতিপাত আমি চাই
জৈবাজৈব সঞ্চরণশীল সত্তার ঘুম
বেঁচে থাকার প্রতিষেধক বিষনুন আমাকে দাও
আমার শ্বাসনালীর খরায় একটু কৃত্রিম বৃষ্টি দাও

অজয় সেন

নিঃসঙ্গ চলাফেরা

কুয়াশা ছড়ানো ভোর রাতে ভেসে আসে আনন্দিত গান
ঘণ্টার শব্দে জেগে উঠি, আমার স্বেচ্ছা চলাফেরার কথা ভাবি,
বেলা বাড়ার সাথে শুরু হয় নিঃসঙ্গ পথচলা
সমস্ত শরীর জড়িয়ে দীর্ঘ সময় ঘুরে বেড়াই মানুষের খবর নিয়ে
তোমাদের উৎসব, তোমাদের শোক, তোমাদেব নিজস্ব হাঁটাচলা
তোমাদেবই তাঁতঘবে।
এখন বারুদ ঠাসা আকাশ, সারাদিন উত্তপ্ত পোড়া বাতাস বয়ে যায়
সমস্ত নির্জন দ্বীপে ;
বহুদিন, বড দীর্ঘ বেলা নির্বাসিত আমি তোমাদের কাছ থেকে
একদিন সন্ধ্যায় আমি চলে যাই সমস্ত ঋতুর কাছাকাছি
তোমবা আমাকে ছ্যাখাও—এই ভাবেই শুরু হয় জীবন।

মনে হয় পৃথিবীতে বহু মগ্ন ঔদাসীন্য আছে
বুকের অনেক গভীরে যে নিদারুণ শিমুল ওড়াউড়ি
কেউ কি বোঝে তা? কেউ বোঝে—কিংবা কেউই নয়।
অনেকসময় তোমাদের চোখের সমস্ত বর্ণহীন আলো উড়ে আসে
আমাকে ঘিরে অসম্ভব শব্দময়তায়, অথচ
আমি কষ্ট পাই আমার প্রেমহীনতায়, আমারই অসহায়তায়।
কিছুদিন আগে কারা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলো ঠা-ঠা হাসি
আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়েছিলো ফুটপাত, যা-কিনা আমারই উপযুক্ত,
আমি তাদের ইদানিং দেখি—কবিতার প্রতি অবিচার
কবিতাই নিয়েছে প্রতিশোধ—কবিতা এখন প্রচ্ছন্ন প্রেমের মত
আসে না তাদের দীর্ঘস্বপ্নে।

যা কিছু পেয়েছি, সব কিছুর সঙ্গেই প্রকৃত পাঞ্জার লড়াই করে,
সবাইয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যবান প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে

সব কিছুই দুঃখ থেকে খুঁটে নিয়ে অকৃত্রিম আত্মবিশ্বাসের জোরে ;
এসময় পেয়ে গেছি আশ্চর্য্য উষ্ণ বন্ধুত্ব, ব্যবধান কমে গ্যালো কাল রাতে,
স্নেহ ও ভালোবাসা নিয়ে পরিব্রাজকের মত তারা হেঁটে এলো আমার
কাছাকাছি।

দীর্ঘ কালো দুঃস্বপ্নের মত হাসপাতাল থেকে ছুটি নিচ্ছে ঐ
খেলার মাঠের সবুজ দুঃখের ছটফটানী ছেলে।

অজয় সেন

স্বাস্থ্য নিবাসের দিকে ভাবনা সকল

এই প্রবাসী শীতে রাষ্ট্র ভাবনায় শব্দ ছুটে যায় স্বাস্থ্যনিবাসের দিকে
সকাল বেলায় তোমরা এসে দাঁড়াও দক্ষিণদিকে মুখ করে—শোনাও
নতুন রাষ্ট্রের কথা, ধন্য ধন্য কর—এভাবেই আমর সাহস বাড়ে
চৌমাথার মোড়ে আমি জোরে হেসে উঠি একদিন—
গণতন্ত্রের ছোঁয়াচ আমাকে নিয়ে এইভাবে দশজন-কে ছুঁলো।
কবে সেই বালকবয়স থেকে বেয়াড়া আস্কারা দিয়েছো,—নষ্ট করেছো
আমাকে বেজায় আদরে,—তাই এই শেষ দশকে দেখে যাও
ক্রমশঃ কেমন ভয়ংকর আর বিপজ্জনক হয়ে উঠ্ছি।
শ্যামলকান্তি থাকে চকলালপুরে কথা ছিলো শেষ পৌষেই বিদ্যুৎ জ্বলবে
তাদের সবুজ গ্রামে আর এইখানে আমাদের উজ্জ্বল পবিত্রব্যের
কথা ভেবে চলে যাবো অনেকদূর ঐ মৃত্তিকার নিচে,
সফলতা, তোমার তলে তলে এত কাজ হোলো?
মানুষ তার স্বনির্বাচিত জন্মপ্রণালী পছন্দ করে বর্ণহীন স্বচ্ছন্দে অন্য মানুষের দরজায়
বিলি-বণ্টন আরেক মানুষই করে —সেই থেকে
আশ্চর্য গণতন্ত্রের ছোঁয়াচ পাবারা দশজনকে ছুঁলো।
পূর্ব দেশের ভালবাসায় মজেছিলো মিনতি, সেসময় আমি যুদ্ধের স্বেচ্ছাসেবক
হয়ে গড়ে তুলেছি বর্ণহীন পক্ষীপালন কেন্দ্র,
মিনতি, তোমার রহস্যময় ছলচাতুরী—আমাকে দাঁড় করায় পারাপারহীন
প্রত্যেকদিন ও ভাবষ্যজীবনের মধ্যে।
দ্যাখো, কি দারুণ কষ্টের মধ্যেও জেগে থাকে জীবন—
ভিটামিনের খোসা মুখের চারদিকে খেলা করে—বিজনও একদিন পরামর্শ দেয়—
"ফিরে যাও যৌথ সংসারে—নষ্ট করো ভ্রান্ত সবুজ মোহ ও হীন পুরুষত্ব,
শুধু আত্মবোধ ও বেদনা যুগপৎ ভেসে ওঠে এই শেষ বিকেলে —
এ আমি ভালোই জানি—গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখা আন্দোলন ভেঙ্গে যাবে
একদিন মানুষেরই স্বাস্থ্যের অভাবে, তবু
এই প্রগাঢ় শীতে রাষ্ট্র ভাবনায় শব্দ সকল ছুটে যায় স্বাস্থ্য নিবাসের দিকে এই অপরাহ্নে

হায় কোলকাতা, তোমার অক্ষম গণতন্ত্র

খু লে ফ্যালো ক্রমশঃ মুখর চিত্রিত মুখোশ, জরাগ্রস্ত শিরাউপশিরা
উড়িয়ে দাও এই শেষ অপরাহ্নে হীনজীবন চিন্তা ও উন্মাদ পৌরুষ
এক দিন একাকী কালকাটাই অদ্ভুত সজীব করাতকলের পাশে
কি উদাসীনতায় তার যাতায়াত মোমের মত গাছের শরীরে,
ঠিক এভাবেই কারা যেন বিশ্বাসী, পরস্পর মঙ্গলসূত্রে, কিছুটা স্বাতন্ত্র্য

প্রতিবন্ধে গড়ে তোলে—সাঁকো, কলোনী এবং বাজার;
তোমাকেও আবিষ্কার করি চন্দনবনের আশরীর আলোয়—আজ।
তোমার ছিলো প্রতিদ্বন্দ্বী, রাষ্ট্রভাবনা—এক গ্রামাঞ্চল উঠে আসে বুকের মধ্যে

চব্বিশ হা-যৌবন খায় ক্রুদ্ধ জন্তু,
হ্যাঃ, কোলকাতা, মিথ্যা উন্নয়ন, হাস্যকর শৃঙ্খলা নিয়ে মেতে থাকো তুমি
গম্ভীর কালো লক-আপে প্রতিবাদী যুবকের মৃতদেহ—রক্ত ও মজ্জার
মধ্যে তার খেলা করে গ্রামীন বিপ্লব ও দখলী জমির ধান ওঠানোর আদিখ্যেতা,
আমারো জানা ছিলো নীল গূঢ় সংকেত, বসন্ত দিনের ধৈর্য ও

অদ্ভুত প্রতিভা
একদিন গ্রীষ্মের অপরাহ্নে সমুদ্র বাতাস ছিঁড়ে খুঁড়ে আমরাই বেরিয়েছিলাম

সৌন্দর্য ও সম্ভাবনাময় নোঙরের উদ্দেশ্যে
অথচ, হায় দ্রোণাচার্য, মিথ্যাই তুমি শেখালে লক্ষ্যভেদ, সুসভ্য নাগরিক তোমার
ক্রমাগত শৈবালগুল্মের মত জটিল হয়ে যাচ্ছে ইদানিং
একই শরীরে, সে একদিন গণতন্ত্রের বাসিন্দে,
একই শরীরে, সে একদিন কলামন্দিরে উদ্দামনৃত্যে, অথচ
অন্য মানুষরা ক্রমশঃ জেনে যাচ্ছিলো মানুষের গন্ধযুক্ত জন্তুদের চোখে চোখ রাখতে
অন্য মানুষ ক্রমশঃ বুঝে নিচ্ছিলো সময়ের বারুদশালার চাবির কথা—
যা একদিন তাদের চিনিয়ে দেবে বিশ্বাসী সবুজ সড়ক—তবু কি
নির্মম ও উদাসীন এই উড়ন্ত গণতন্ত্রের খোসা—যা এই
বিকেলে ঢেকে দেবে নিবীর্য সহর আর তার সুসভ্য নাগরিকদের—আজ।

শুভ মুখোপাধ্যায়

নিয়ত একাকী

এখন দু-হাত দিগন্ত করে দাঁড়ালেই,
প্রতীক্ষায় দীর্ঘ রাত পড়ে আছে
আমার নিশীথিনী মায়ের মুখ ;
নিকানো উঠোন ছেড়ে
মৃতের কাঁধে হাত ঝুলিয়ে
আমি আমার সহোদর অন্ধত্ব
জন্মদাত্রীর যন্ত্রণাকে ঘিরে রয়েছি,
প্রতীক্ষায় দীর্ঘ রাত পড়ে আছে
আমাব নিশীথিনী মায়ের মুখ।

কেন আমাকেই নিরুদ্ধ একাকী
জন্ম যন্ত্রণাব মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়,
কেউ তেমন উৎসব করে বিদায় দেবে না জেনেও
কার উন্মাদনায়
আমার অপেক্ষা দীর্ঘতব হয়—

যেন আজীবন কাউকে পিছনে হারিয়ে আসছি,
যে আমাকে মৃত্যুহীন আয়ুষ্মান কবে যেত—
যে আমাকে সমাহিত প্রতীক্ষায়
হাতে তুলে দিত নির্মাণের মাটি।

এখন তোমার প্রসন্ন নয়ান চেয়ে
আমি ঋণী রইলাম
দুরাভাস দৃশ্য হয়ে থাক তুই পরবাসী।

শুধুমাত্র আমিই

সেইদিন,—শুধুমাত্র আমিই চলে যাচ্ছি,
শৈশবের ঘুমন্ত প্রান্তর ফেলে
শুধুমাত্র আমিই।
আমার বুকের ভিতর
ইহুদি মায়ের প্রেমিক ছেলেগুলো
বন্দী খেটে পাগল হয়ে গেছে ;
বেলা ভরে এলে ধ্বনিময় বসন্ত নিয়ে ফিরব,
শুধুমাত্র আমিই
এইদিন শৈশবের ঘুমন্ত প্রান্তর ফেলে চলে যাচ্ছি

শুভ মুখোপাধ্যায়

সে জনের ভুবনেশ্বরী মা

সে বলেছিল,
তাব বাগান ভবেছে ফুলে
তার ভালবাসায় ভোব হচ্ছে
তার রূপ তরাসী গাঁয়ে
পশ্চিমেব আকাশ জুড়ে
আগুনের জন্মদাত্রী মা
তাকে পথ দেখাচ্ছে ;
তার ভুবনেশ্ববী মা।

সে বলেছিল,
মা, তোমার দু হাত ভবে আনন্দ নিকেতন—
তোমাব ভালোবাসায় আমার ভোবেব আকাশ,
যখন তুমি এলে
তখন উত্তর বারান্দায় নির্জন অন্ধকাবে
শরীরিনী জ্যোৎস্না।

এবার ঋতু বদল কবে দাও,
আবার এই আমাব পথ
মুক্ত চলে যাওয়ার প্রান্তব
জন্মদাত্রী মায়েব দেওয়া

রূপ তরাসীর বাতাস, সমস্ত শরীব
এখন মোহিনী হয়ে ফুটিছে
তার ভালোবাসায় ভোর হচ্ছে—
আগুনের জন্মদাত্রী মা
তাকে পথ দেখাচ্ছে
তার ভুবনেশ্বরী মা।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভ্রমণ প্রস্তাব

তোমার সঙ্গে আজ বাংলাদেশ দেখতে বেরোলাম—
যখন কাঁচের আড়াল থেকে টুথব্রাশসহ উঠে বসছে মানুষ,
ভ্রমণকারীর মতো পোষাক ও মুখভঙ্গী আমার
কোথায় নিয়ে যাবে চলো—
যে কোনো সিঁড়ির ভাঁজে তাসের ম্যাজিকের মতো
তোমার হারিয়ে যাওয়া
এবং আবার দেখা পাওয়ার মধ্যে উদ্বেগ নিয়ে
পেছনে পেছনে আছি।
তুমি ব্যারেলে হাত রাখলে
ক্ষিপ্র অশ্বারোহীর মতো আমি তাকে কাটিয়ে যাবো
যেখানে যাবে চলো
আমি গোড়ালী দুটো অনুসরণ করে
ভূতের মতোন আছি।
তোমার সঙ্গে আজ বাংলাদেশ দেখতে বেরোলাম—
প্রতিটি দুয়োর ধ'রে অনুসন্ধান শুরু হোক ;
প্রতিটি নিস্তব্ধ গাছের পাশে দু-এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা
পরিত্যক্ত পথ থেকে পায়ের ভেতর দিয়ে
বাথরুমেও যাওয়া হবে, রক্তাক্ত তুলোর মধ্যে,
সাবানের ফেনায় পিচ্ছিল তোমার শরীর ধরে পুনরায় জেগে ওঠা খরিষ
এমন কি তোমার নষ্ট দড়িদড়া
কানি বা কাপড় সমস্ত কিছু ঘুরে আসবো
তোমার সঙ্গে তোমাকেও দেখতে বেরোলাম আজ—
কোথায় নিয়ে যাবে চলো
ভ্রমণকারীর মতো পোষাক ও মুখভঙ্গী আমার।

হল্ট স্টেশনের ভাবনা

আমরা গাছের মতো পাশাপাশি শুধু আত্মবিশ্বাসকেই চেয়েছি—
আত্মবিশ্বাস অর্থে তুমি।
পারিনি ঝুঁকে পড়া সিগনাল থেকে সিগনালের মানে বুঝে নিতে।
প্রতিটি স্টেশনে বিদেশী লোক হাত পা নাড়ে
তার মধ্যেও তোমাকে আলস্যহীন আবিষ্কার আমাদের।
এই যে অপরিচিত মানুষজনের ভিড়ে নিজস্ব জবা ফেরি করে আসা
তা-কি একসময় সুদিন এসে পড়বে
তার অপেক্ষায়?
রাত্রের ছুটন্ত ট্রেনে দেখা গেল প্রতিটি গাছ
একসময় দৃষ্টির বাইরে চলে যায়—বিপরীত যাত্রা তাদের।
ভয় হয়, তুমিও কি কোপাই স্টেশনে ওই অজ্ঞাত যাত্রীটির মতো
মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলে যাবে—
বাতিপোস্ট পিছনে রেখে।
আমাকে হয়তো বা স্টেশনে স্টেশনে
বার্ধক্য ফেরি করে আসতে হবে সারাজীবন॥

স্টিল লাইফ

তোমার জন্য একটি কবিতা সারাবছর ধরে লিখতে থাকলুম—
কবিতার মধ্যে রোদ, বৃষ্টি, দিন ও রাত্রির ক্রমান্বয় অস্তিত্ব,
পুরোবছর ডুবে রইলুম পোকামাকড়ের সঙ্গে টেবিল ও কাগজ কলমে।
দীর্ঘদিন স্নান না করায় বিশ্রী গন্ধে ভরে এল সমস্ত শরীর,
চুল বড় হয়ে নেমে যায় হাঁটুর নিচে,
কেবল বুলডগের মতো দুই চোখ জেগে থাকে পাতার অত্যন্ত ভেতরে।
ঘরের এক এক জানলায় একেকবার দেখলুম—আশ্চর্য ভোর,
চারিদিকে, ঠিক যেন ভোর নয়—
জরায়ু থেকে পিছলে নেমে আসা মানুষ।
উঁচু চারতলার ফেলে দেওয়া ছাইয়ের ঝুড়ির সমস্ত ছাই
আমাকে পুঁতে ফেলল গলা অবধি ঘরের ভেতর;
এরপর কিছুক্ষণ পর্দার সিনেমা দৃশ্যের মতন অবিরল গর্জনকারী
ছাইয়ের ঝড় শুরু হয় জানালার বাইরে।
কবিতার গা থেকে জেগে উঠল অসংখ্য পয়ঃপ্রণালী,
শিরায় রক্তের বদলে দুর্গন্ধের চলাচল টের পাই;
প্রকৃতপক্ষে সন্দেহজনক দীর্ঘসময় থেমে রইলুম, কেননা টেলিগ্রাফপোস্টের
পেটে তখন আলৌকিক কথাবার্তা বলে চলেছিল।
যতক্ষণ না লুকিয়ে পড়ার যোগ্য রাত্রি আসে
তার আগেই কবিতার মধ্যে ভেসে এল একটি মাছের মরা চোখ॥

কখনো বা কবিতাটির গায়ের এক অদ্ভুত নিঃশ্বাস ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে
ও সমস্ত ঋতুর আসা যাওয়া শুরু হয় এর নাভির উপর।
যে কবিতাটি আমি সারাবছর লিখে উঠতে পারছিলুম না তোমার জন্য,
একসময় তা আমাকে ছাড়াই লেখা হয়ে যেতে থাকল;
আঙুল থেকে কলম খসে পড়ে
তা আপনা-আপনিই নড়াচড়া আরম্ভ করে—।

বুঝতে পারলুম, আমার কবিতার কাছে আমার অস্তিত্ব এখন ন্যূন—
সে নিজেকে নিজেই লিখে নিতে চায় সহজে।
হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ চুলগুলি, এবার হিংস্র শেকড়ের মতো খেয়ে ফেলল
আমার দুচোখের মণি।

নিরুপায় সারাজীবন শুধু কোলের ওপর হাত রেখে বসে রইলুম
অভিনব আত্মহত্যায়।
তখনই নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে একটা প্রচণ্ড বড় চাঁদ,
বিশাল ওই সেগুন গাছের পাশাপাশি চুপচাপ দাঁড়ালো॥

ধূর্জটি চন্দ

রুনু এবং ল্যাম্পপোস্ট

হাহাকারের ভিতর জেগে উঠি আমি, ছুটে যাই তোমার দিকে
তুমি আমার পুরুষ, আমার ল্যাম্পপোষ্ট, আমার এক জীবনের গতি,
বাতির সংকেতে তুমি চৌচির ভেঙ্গে দিলে আমাদের বুক ও ভালবাসা
আর রুনু ভেবে ত্যাখো এই সেদিনও তুমি কী অবাক আমলকী ছিলে,
গরমে আচার খেতে ভাল লাগতো আমাদের, শীতকালে পশম জড়াতে
চেরীফল ফুটে উঠতো এক একটি চুমুতে টোল-পড়া গালের ক্যানভাসে,
হায় রুনু, তুমি আমার সাতবছর আগের প্রেম, ছদ্মবেশে ঢুকেছো সিন্দুকে।
এভাবে মানুষ ঠকে মানুষের কাছ হতে, ধ্বস নামে সাজানো বাগানে,
সব ফুল মরে যায়, দলিত মথিত হয়ে হরিদ্রাভ ঘাস পড়ে থাকে ;
তবুয়ো মানুষ বাঁচে, কেননা বাঁচতে হয়, খোলা চোখ রাখে-সে সড়কে,
কখোন সময় হয়, আলোর বাতাস আসে, জানলা গলিয়ে অই ঘরে।
এবং আমিও রয়ে গেছি এখানে যেমন ঐ শিশুটিও বাঁচে,
ফারেক্সের টিন থেকে উঠে আসে জীবনে, টাল খায়, টাল খেতে খেতে
ট্রাজিক আনন্দে টলে তার আশরীর, গৃধ্নু মাটীতে ঢোকে শেকড়
আর আমাদের দুঃখ, আহ্, মানুষের দুঃখ, ঐ হাসি-আঁটা ছবিটির মতন
অনন্তকাল ধরে থেকে যায় জীবনে, পৃথিবীতে, আদি-অন্ত কাল।
সুনসান হয়ে পড়ে ভিতর বসতবাটী, তবু রোদ প্রত্যহ সকালে
অইখানে ত্যাখা ত্যায়, হাহাকারের ভিতর গন্তব্য কাছে চলে আসে
আর আমাদের দুঃখ, আহা, মানুষের দুঃখ, তার একজীবনের অপরাধ
এভাবেই একসময় স্খলিত হয়ে পড়ে তোমার সান্নিধ্যে এসে।
তবু কিছু থেকে যায়, পরিত্যক্ত সড়কে প্রজন্মের ক্ষত থেকে যায়,
সভ্যতার পন্টিয়াক্ ঐ ত্যাখো ছুটে যায়, ক্রমে ক্রমে শহর ছাড়ায়,
ছাড়িয়ে কোথায় যায় ? কোন্ গণ্ডগ্রামে যায় ? কোন্‌খানে, কোন্ বিদেশে ?
সেখানে কি রুনু আছে ? অন্যকারো বধূবেশে গরম তেলে ভাজ্‌ছে কি কই ?
দাওয়াতে গ্ল্যাক্সো নিয়ে প্রজন্ম খেলা করে, এদিকে ব্যথা নিয়ে রাতে

একা একা হাহাকার একা একা হাহাকার একা একা রাত কাটে আমার।
পৃথিবীতে চিরদিন এইসব রাতগুলি বড়ো দীর্ঘ, বড়ো ম্লান হয়
মানুষেরা একে একে গুটি গুটি পা-য় পা-য় শেষ প্রান্তে উপনীত হয়—
সেখানে আলোর রঙে ধুয়ে মুছে যায় ক্লেশ, আর আহা, এই সেই সড়ক
চিরদিন পৃথিবীতে টান-টান পড়ে থাকে দুই প্রান্তে বাঁধা থাকে তার
বিষাদের শেষ-শুরু, এইতো মায়াবী পথ, বাঁচবার একমাত্র পথ
মানুষ নামক প্রাণী বুকে ভর দিয়ে তায় হাঁটে যায়, হেঁটে হেঁটে যায়
তারপর সব শেষ, নৈরাশ্য থাকেনা তার, কোনো স্বপ্নে হয়না সে লীন,
যেন সব ভুলে গিয়ে জ্যোতির আনন্দে জ্যোতির্ময় হতে চায় সে।
এইতো মানুষ-মন, স্বপ্নেও ভাবেনা সে কতো শ্রম, কতো কাতরতা
একদিন এই পথে পায়ে পায়ে ঝরেছিলো, গোড়ালিতে বিঁধেছিল তার
সুগোপন তূণ হতে অতিদ্রুত ছুটে-আসা নীলবিষ মাখা সেই তীর;
স্বপ্নেও ভাবেনা সে, মানুষই মেরেছে তাকে মানুষের গভীর অসুখে।

আর আমি, এই গ্যাখো, ধনুকের মত নুয়ে রুনু নামে একটি কবিতা
যখনি লিখতে বসি কেঁপে ওঠে বুক আর রক্ত নাচে খুলির ভিতরে,
একটি হাতুড়ি তখন, কবিতার চেয়ে যেন, বড়ো বেশী প্রিয় মনে হয়
তবুয়ো পারিনা আমি, ভুলতে পারিনা কেন, রুনু আছে, রুনু ঐখানে।
কেউ কি কখনো ভোলে? চোখের জলের দাগ কোন রোদ কি মুছে দিতে পারে?
রুনু কি পেরেছে কভু পশমের শাল থেকে সব আঁশ ক্রমশ ছাড়াতে?
তবুয়ো তো বেলা যায়, বেলা বহে চলে যায়, নদী থাকে নদীর মতন
মধ্যরাতে ঘুরে ফিরে কার ছায়া এই ঘরে উঁকি মারে যখন-তখন?
এভাবে সমাপ্তি আসে, গীর্জায় ঘণ্টা বাজে, বিষাদ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে
মানুষের অনুভূতি মমি হয়ে তোলা থাকে মানুষেরই মিউজিয়ামে।
রুনু তবু রুনু থাকে, কাল রাতে কে-যেন টিয়াপাখী মেরেছে গুলিতে
সে-সময় ল্যাম্পপোষ্ট ঐ দিব্য হাত তোমার, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে
আয় আয় চলে আয় আলো আছে কাছে আয়, আলো আলো, আলো এইখানে

হায় রুনু, তুমি আমার, সাতবছর আগের প্রেম, ছদ্মবেশে ঢুকেছো সিন্দুকে।

ধূর্জটি চন্দ

হলুদ বাতি

হলুদ বাতিটি দ্যাখো আজো সেই ঝুলে থাকে নিঃসঙ্গ পোস্টের গায়,
বুঝিবা তার কাছে এই প্রকার ঝুলে থাকার অন্য কোন প্রয়োজন আছে ;
অথচো বাতিটিও মাহাত্ম্য নিয়ে থাকে যতক্ষণ জ্বলন-ক্ষমতা,
অর্থাৎ এইরূপেই স্বীকৃতি পায় গুন, যে গুনের উজ্জ্বল প্রকাশ ;
নাহলে সাদাহ্ন গুন হিম আঁধারের ভিতর ক্রমশঃ প্রচ্ছন্ন হ'লে
মানুষের কাছ হতে সেই গুনের ধারকও নিবিড় আড়াল হয়ে যায়
আর এভাবেই নিঃসঙ্গতা কাছে আসে মানুষের, খেলা করে রক্তের ভিতর,
বুঝিবা তখনি-সে স্মৃতির পালিশ নিয়ে বেঁচে থাকে এই পৃথিবীতে
অথবা থাকতে চায়, স্মৃতির ভিতরে ডোবে, আহা সে-ও হোতে পারতো এমন
অথচো হলুদ স্মৃতি স্মৃতিরূপেই থেকে যায় পরিত্যক্ত সাধনীর মতো
লাগেনা কোন কাজেই ব্যবহারিক জীবনে, ঘটেনা তার পুনর্বিকাশ
যথাযথ জীবনে, ঠিক যেমন স্মৃতিতে, তাহলে তার উজ্জ্বল প্রকাশ
এসময়েও হতে পারে, অথচো এখানেই সব তত্ত্বের গূঢ় সারতা—
জীবনে একবারই বাতিটি জ্বলে ওঠে এবং একবারই নেভে ;
তবুও নিঃসঙ্গতা সেই নেভা বাতি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে এই শীতে,
হয়তো এইভাবে আজো ঐ বাতিটির ঝুলে থাকার মানে পেয়ে যাই
আর, এইরূপ হ'লে, সান্ত্বনা ফিরে আসে এই নীল পউষের রাতে।

মানুষের জিহ্বা থেকে

মানুষকে বেসো না ভালো, বরং ঐ কুকুর-ছানার লোমের ওপরে রাখো হাত,
ত্যাখো, কী সপ্রতিভ কালো ও হলুদ ছোপ, কৃতজ্ঞ ঐ চোখ দুটি ;
মানুষের সঙ্গে থেকে তুমি কি কোনোদিন এই বোধ ক্রিয়াশীল দেখেছো ?
বরং দেখতে চেয়ে নিজেই তো হা-চিবুক এরেণার বাইরে এসে গেছো।
বস্তুত সেই থেকে রয়ে গেছো এখানে, আজো তাই ক্ষুব্ধ গোড়ালি
তোমার শিকড় হয়ে সুদূর প্রবাসে যায়, দেখে নেয় তাবৎ ছেনালি
আর তুমি অভিমানে বড়ো অভিমানী হয়ে অহংকারে পোড়াতে চেয়েছো
এই আতা সভ্যতা, ন্যাকা ও থুতুচাটা, নির্বীর্য এই সুধীসমাজ।

আফশোষ থেকে তোমার এরকম জ্বলে ওঠা, ক্রমশঃ তাতিয়ে নেয়া শরীর,
অথচো তুমি তো জানো, মানুষের জিহ্বা থেকে কোনোদিন মুক্তি পাবে না,
কেননা এই সভ্যতা বারবার ব্যবহারে শুষে নেবে অগ্ন্যাভ ঘাম
তখোন দস্তানার ভিতর বন্দী হয়ে কেঁপে উঠবে পোড়া হাত, হাতের আঙুল,

পঁচিশ বছর তুমি লড়াই করেছো একা, দেখেছো মানুষের দাঁত
এখন মানুষ নয়, বরং ঐ কুকুরের লোমের ওপরে রাখো হাত।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশ যোগ্য হলে

চাপা রাগ দিয়ে চোখ ধুয়েছি, প্রকৃতি তাকাতে বলো না
তোমার চন্দনগন্ধ মুখে, অমল করপুটে ধরো না এই চোখ
পৃথিবীকে আগে একুশবার পাপমুক্ত করি, পৃথিবীকে
শেষ জল্লাদের হাতে সমর্পণ করি।
গোখরোর ঝাঁপি খুলে গেলে
অকারণ পথিক পরিষ্কার বিষে ঝাঁপ দেয়—সইতে পারি না
শক্তিমান পতঙ্গের লাস পিঁপড়ে বাহিনী বহন করে নিয়ে যায়
আমি আহত চোখে দেখি

তোমার দ্বীপে বেড়াতে গেলে ভূমিকম্প রোগ শোক
অহর্নিশ গরলবিষ ছড়িয়ে বড়ো বিরক্ত করে
প্রকৃতি, আগে পাপমুক্ত করি সরল কুঠার দিয়ে
সরলকুঠারে পাপীবৃক্ষের হাতপা ভাঙি
তারপর অলৌকিক তন্ময়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

পরিবেশ আগে যোগ্য হোক, তারপর কথা হবে।

দীর্ঘ ব্রীজে ভৌতিক বারোটা রাত

দীর্ঘ ব্রীজের পঞ্চম স্তম্ভের কাছে এখন ভৌতিক বাবোটা রাত
সিগন্যালহীন গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে শীতল শিশিরে
স্থানু অন্ধকারে
দূরে জোনাকীর আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কে মৃদু শিষে ডেকে যায়
প্রেম……ও আমার দোলনকরবী
কে যেন গান শোনায় তলদেশে হিমনীরে
নদীতটে পাষাণী অহল্যায়
সম্মোহনে চলে এসেছি এই দীর্ঘ ব্রীজে
মলিন ছায়া নির্বিকাব শয়ানে শ্রুতিতে তুলে নেয়
চ্ছলোচ্ছল জল
এই দেহ ভালবাসাহীন ভালো লাগে না
এই হাত শবীর চুল ভাসিয়ে দেবো মাঝ সেতু থেকে
তলদেশে হিমনীর ফুঁসে উঠছে গায়েব গন্ধে
টের পাচ্ছি তাব বুক উঠছে নামছে আলিঙ্গনেব প্রত্যাশায়
সম্মোহনে চলে এসেছি দীর্ঘব্রীজে এখন ভৌতিক বারোটা
তলদেশে জমে আছে স্নিগ্ধ অন্ধকাব

কাঞ্চনের কাহিনী

ধরা যাক তার নাম কাঞ্চন। সে কখনো থাকে নি একা
দুধগন্ধ ছোটবেলা হৈ চৈ কেটে গেছে রূপোর ঝিনুকে
একটু বয়স হলে জন্মদিনে উপহার জমে গেছে স্তুপ
তারপর লালবলে অবধারিত লক্ষ্যে ভেঙেছে সার্সির কাচ
এবং যুবককালে দেখা গেছে অলকার সাথে
মগ্ন কথনে
সে প্রকার কামতাপ এখন বিপরীতে বলা যায় লেশ
তারমানে এই নয় কাহিনীর শেষ
যেন দুধের দাগের মতো পাত্রের ভিতরে

এখন যুবক কাঞ্চন, যে কখনো থাকেনি খুব নিরুপায়
আশ্চর্য একা থাকে, ঘাসের সান্নিধ্যে কামিনীবিহীন চলে যায়।